রক্তের উপরে সৌধ

তারকচন্দ্র ঘোষ

প্রতিমা প্রকাশনী
স্টেশন রোড চুঁচুড়া হুগলী

ভূমিকা

ডাঃ তারকচন্দ্র ঘোষের বইয়ের সংখ্যা সতেরো পেরিয়েছে। তাঁর নানা বিষয়ে লেখা বইগুলি সমাদর লাভ করেছে। বাংলা ও ইংরেজি সংগীত-গ্রন্থ দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বিস্ময়কর উত্তরণ ঘটে বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রবন্ধ-পুস্তক রচনায—আধ্যাত্মিক-বোধের সঙ্গে বিজ্ঞান-চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা গেছে এই-সব পুস্তকগুলিতে। তারই পরিপূরক দেখা যায় রহস্যময় সত্য-কাহিনীগুলিতে। প্রাণের নিভৃত রস-মাধুর্যকে নিজস্ব অভিজ্ঞতায় জারিত করে পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর নিষ্ঠা, অনুশীলন ও পরিচর্যা কখনও বিজ্ঞান-নির্ভর কখনও-বা আধ্যাত্মবোধমণ্ডিত। বিচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধান ক্রমশঃ বিচিত্রতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। শুধু নিরস বিজ্ঞান-চর্চা নয়, বাস্তববোধের সঙ্গে মানবিকতাবোধের মিশ্রণ পুস্তকগুলিকে রসগ্রাহী করে তুলেছে। সংগীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান—বিচরণের এই বিন্যাস ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ ও অকুণ্ঠ প্রকাশ প্রকৃতই অভিনন্দনযোগ্য।

এতদিন তাঁর রচনার যে ধারা দেখে আসছিলাম, তার সঙ্গে অকস্মাৎ নতুন সংযোজন অন্য একটি বিচিত্র ও অভিনব ধারা যুক্ত হয়েছে—তাঁর এই প্রথম উপন্যাস-রচনার প্রয়াস। প্রথম বটে, কিন্তু রীতিমত সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত, কঠিন বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে স্থানে স্থানে হয়তো শিথিলতা প্রকাশ পেলেও, গঠন-কৌশলে সাবলীলতা বিদ্যমান। উপন্যাস-রচনার ডালপালাগুলিকে যথাযথ বিন্যস্ত ও বিস্তার-লাভ করায় নৈপুণ্যের সঙ্গে তাকে এক রসবিন্দুতে সংস্থাপন করা এবং পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করা সহজ নয়। ডাঃ ঘোষ তা পেরেছেন এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

মানুষের জীবনের এমন এক জটিল ও কঠিন দিককে তিনি বেছে নিয়েছেন যা উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে দুঃসাহস। উপন্যাসের গোড়া

থেকেই নায়কের মনে সংশয় ও চিৎকার—কাহিনীকে ঘণীভূত করে তোলে এবং ক্রমে পরিণতির দিকে রহস্যময়গতিতে এগিয়ে গেলেও সেই জটিল আবর্ত রচিত হয়—জন্মবৃত্তান্ত জানার আকুলতা এবং তা জানার পরেও তার মানসিক বিশৃংখলা। ভাগ্যের হাতে মানুষ যে কত অসহায এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিয়তির কত-যে প্রহার সহ্য করতে হয তারই এক সমস্যা-জর্জরিত বিষাদ-সংকট আখ্যান—'রক্তের উপরে সৌধ'।

রক্তের সম্বন্ধ এবং স্বপ্নে সৌধ যেভাবে রচিত হয়েছে এবং ভেঙ্গে পড়েছে তারই বেদনা-মধুর এই আখ্যানটি পাঠকেরা অতঃপর আস্বাদ গ্রহণ করুন।

॥ এক ॥

তখন আকাশ-আঙিনায় দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকু মুছে নিয়েছে সন্ধ্যা। শহর সেজেছে আলোকমালায়। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ ডি. সি. দীক্ষিত নিজের চেম্বারে বসে দূরভাষে কথা বলছেন, মিঃ শ্যামলাল চাড্ডা ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে এক যুবক। মিঃ চাড্ডা ডাক্তারবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বোম্বের বাসিন্দা। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ধনপতি কারবারি। কাজের সুবাদে তাঁকে হিল্লি-দিল্লি চুঁড়ে বেড়াতে হয়।

ডাঃ দীক্ষিত ইঙ্গিতে বসতে বললেন। কথা সেরে তিনি বলেন 'শ্যামলাল যে—। খবর কী? ভাল আছো তো?'

'চলে যাচ্ছে।' মিঃ চাড্ডা ইসারায় যুবকটিকে দেখালেন।

ডাঃ দীক্ষিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকের আপাদমস্তক জরিপ করে নিলেন। তার গৌরবর্ণ জলজলে চেহারা। বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুদীর্ঘ। বলিষ্ঠ। মাথার চাঁদিতে চুল খুব পাতলা। উসকোখুসকো। রুক্ষ। দু-তিন দিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি। চোখ-মুখ শুকনো। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কপালে কালসিটে। চওড়া বুকেব ছাতি। পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি। জামার বাঁ হাতা নিচের দিকে ছেঁড়া। পায়ে সাদা চপ্পল। সে তখন ঘনঘন মাথা নাড়ছে আর আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকে যাচ্ছে। ডাঃ দীক্ষিত দেখছিলেন। 'ভারী সুশ্রী দেখতে। গুড্ লুকিং। কে?' তিনি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ চাড্ডার দিকে।

'চিনি না।'

'চেনো না।' ডাঃ দীক্ষিত অবাক। 'তবে?'

'বলছি।'

তার আগেই জল খেতে চাইল যুবক।

কলিং বেল বেজে ওঠে টুং টাং। বেয়ারা এক গ্লাস জল নিয়ে আসে। যুবক চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেয়। ভঙ্গিটা ভাল নয়। অস্বাভাবিক।

ডাঃ দীক্ষিতের ভুরু কুঁচকে ওঠে। কৌতূহল জাগে।

মিঃ চাড্ডা বলতে শুরু করলেন: 'সে এক কাণ্ড। হাওড়া স্টেশন।

প্লাটফর্মে সবে পা বাড়িয়েছি বোম্বে মেল ধরবো বলে। ছাড়তে কিছু দেরি আছে। হাতে আমার অ্যাটাচি কেস। পাশের লাইনে একটা লোকাল দাঁড়িয়ে। ছাড়বো-ছাড়বো করছে। বাদুড়-ঝোলা ভিড়। প্লাটফর্মে-ও ভিড় নেহাত কম না। এমন সময় চমকে উঠলাম একটা আকস্মিক চিৎকারে—'আমি কেন বাবার মত নয়?' কানে অদ্ভুত ঠেকল। কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা। পতন থেকে নিজেকে অতিকষ্টে সামলে নিলুম। তবে কেসটা ছিটকে পড়ে যায়। কুড়িয়ে নিলুম। দেখি, এক জোয়ান লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে বেপরোয়াভাবে। আমার সামনে সে এক ফেরিওয়ালাকে জোর ধাক্কা মারে। উল্টে পড়ে বাদামের ঝুড়ি। কনুই-এর গুঁতো মেরে ফের একজনকে ফেলে দিল সে। পর পর আরো কয়েকজন মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। হাঁড়ি-কলসীর দোকানে একটা মাতাল হাতি ঢুকলে যে অবস্থা হয়, কতকটা সে-রকম। লোক দিশেহারা। আর তখন বাতাস কাঁপছে তার উদগ্র চীৎকারে—'আমি কেন বাবার মত নয়? হু অ্যাম আই? আমি কে?' ছেলেটিকে দেখে আমার মনে একটি মুখই বারবার ভেসে ওঠে। সে মুখ জয়শংকরের। আমার ছেলে। চেনো নিশ্চয়ই?'

ডাঃ দীক্ষিত ঘাড় নাড়লেন। যার অর্থ, 'হ্যাঁ'।

মিঃ চাড্ডা বলতে থাকেন, 'উভয়ে সমবয়সী বলে বোধ হয়। মুখের আদল ও চেহারায় আশ্চর্য রকম মিল। কী আর বলবো? স্নেহের নাড়ীতে পড়ল টান। উথলে ওঠে মমতা। আমি অস্থির হয়ে পড়ি। যা হোক, ছেলেটির পিছু নিলুম। জনতা তার আচরণে বিরূপ। সোচ্চার হয়ে ওঠে। শুনি ক্রুদ্ধ গর্জন—ধর ধর ওকে মার মার ··। তার বিপদাশংকা করি। ভয়ে কেঁপে উঠি। শুরু হবে গণ-ধোলাই। আমি পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলি। ততক্ষণে গার্ড সায়েবের বাঁশি বেজে গেছে। আর লোকাল-ও গড়াতে শুরু করেছে। সেই মুহূর্তে ছেলেটি আচমকা ঝাঁপ দেয় লাইনের ওপর, জনতা হা হা করে আর্তনাদ করে ওঠে। ট্রেন ব্রেক ক'সে থেমে যায়। অল্পের জন্যে রক্ষে। চকিতে জনা-চারেক উৎসাহী যুবক লাইনের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তারা চেংঝোলা করে তার বেহুঁশ দেহটা প্লাটফর্মে তুলে আনে। একজন রেলের কর্মী তার চটিজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে আসে। এক সহৃদয় ব্যক্তি আঁজলাভর্তি জল এনে তার মাথায় থাবড়ে দিলেন। চোখে-মুখে ঝাপটা। ট্রেন ছেড়ে দেয়। ভিড় পাতলা হয়।

ছেলেটি তখন চোখ মেলে উঠে বসে। আমি অদূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছি ইতিমধ্যে বোম্বে মেল-এর বাঁশি বেজে ওঠে। ততক্ষণে গিয়েছি—ছেলেটির মাথায় গণ্ডগোল। আবার কী করে, ঠিক নেই। হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে তার নড়া ধরে টানতে টানতে মেল-এ উঠে পড়লুম। ট্রেন ছেড়ে দেয়। তারপর বোম্বে পৌঁছেই সোজা তোমার এখানে।'

'ইন্টারেস্টিং।'

ডাঃ দীক্ষিত যুবকের দিকে তাকালেন। 'তোমার নাম কী?'

'আমি কেন বাবার মত নয়?' যুবকের জড়িত কণ্ঠের প্রলাপ: 'আমি কে?'

'তোমার বাবার নাম কী?'

নীরব। উদাস।

'বাড়ি কোথা?'

নীরব। হতাশায় আচ্ছন্ন তার মুখখানি।

তারপর তাকে বেড-এ শোয়ান হলো। কোন আপত্তি করল না সে। ডাঃ দীক্ষিত পরীক্ষা করে চেয়ার-এ বসলেন। বেয়ারা তিন কাপ কফি দিয়ে গেল। রোগীকে এক কাপ দেওয়া হলো। সে ধীরে ধীরে খেতে থাকে। ডাঃ দীক্ষিত দেখছেন আর চাপা স্বরে বলছেন: 'কেস খুব জটিল। মনের কথা বোঝা কঠিন, দুরূহ। তবে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি।'

'কী?' মিঃ চাড্ডা উৎসুক হলেন।

ডাঃ দীক্ষিত এক চুমুক কফি খেয়ে বলতে থাকেন: 'ওর নামের আদ্য অক্ষর 'এম্' আর বোস, বিশ্বাস, ব্যানার্জী গোছের একটা পদবি। আমি তো অনেকদিন কলকাতায় ছিলুম। বলতে গেলে কলকাতার সঙ্গে আমার নাড়ির সম্পর্ক। বাঙালিদের ও-রকম পদবি আছে, জানি। সবজান্তা নই, ওর বাড়ির ঠিকানা ঠিক বলতে পারবো না। অনুমান, নিউ আলিপুর বা কাছাকাছি অন্য কোথাও।

'বলো কী।' মিঃ চাড্ডা লাফিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ। শুনলে আবো আশ্চর্য হবে—। ছেলেটি পেশায় চিকিৎসক।'

'চিকিৎসক!'

ডাঃ দীক্ষিত ঈষৎ হাস্যে বললেন, 'চমকে উঠো না। ও কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে মনের ওপর একটা জোর আঘাত পায়। তাতেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। আত্মহননের চেষ্টা সেই কারণে।'

তিনি একটু থামলেন। ফের বলতে শুরু করলেন :

'তবে আমার খটকা লেগেছে কোথায়, জানো। আমি কেন বাবার মত নয়—এ কথাব অর্থ কী? তবে কী বাবার চেহারার সাথে ওর কোন সাদৃশ্য নেই? নাই-বা থাকল। ক্ষতি কী? সংশয়ের তো কোন কারণ দেখছি না। এ-ব্যাপারে জিনেব তো হাত থাকতে পারে। নিজে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হয়ে বুঝতে পাবলাম না। এ হতেই পারে না। মানসিক বিপর্যয়েব কাবণ অন্য-কিছু। বহস্য। বুঝলে, শ্যামলাল, রহস্য।'

'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন কবতে পারি? অবশ্যি এ-রকম প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা।'

'না না। স্বচ্ছন্দে।'

'রোগীর সঙ্গে আমি ঘন্টার পব ঘন্টা কাটালুম। কিস্যু বুঝতে পাবলুম না। অথচ তুমি তাকে কয়েক মিনিট দেখেই এতো সব বুঝলে কী কবে?'

ডাঃ দীক্ষিত হেসে উঠলেন। 'তবে শোন : বোগীর বাঁ হাতে কব্জিব ওপর দিকে উলকি দিয়ে লেখা আছে M. B এম হচ্ছে নামের আদ্য অক্ষর আব বি হচ্ছে পদবি। পাঞ্জাবিতে যে টেলব মার্ক' বা দর্জির টিকিট বয়েছে, সেটি নিউ আলিপুরের। সাধারণতঃ লোকে কাছে-পিঠে দোকানে জামা-প্যান্ট তৈবী করে। অবশ্যি এর ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়।'

'ওকে চিকিৎসক কী কবে বলচো?' মিঃ চাড্ডার জিজ্ঞাসা।

'বলছি। বলছি।' ডাঃ দীক্ষিত শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলেব ওপর নামিয়ে রাখলেন। 'শোন শ্যামলাল। এ-টা অবশ্যি চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই ব্যাপার। তবে জটিল কিছু না। রোগ নির্ণয়েব জন্যে বাঁ হাত রোগীর দেহেব ওপর বেখে ডান হাতের মধ্যমাব ডগা দিয়ে, বাঁ হাতের মধ্যমার পিছনে, টোকা মাবা হয়। একে বলে পারকাশন্ (Percussion)। দীর্ঘদিন এরূপ মৃদু আঘাত করলে বাঁ হাতের ঐ জায়গায় কড়া পড়ে। বহু প্রবীণ চিকিৎসকের হাতে এ-রকম কড়া আছে। একটা ছোট্ট কড়া রয়েছে রোগীর বাঁ হাতের মধ্যমায়।' এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। ডাঃ দীক্ষিত কথা সেবে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। 'হ্যাঁ, ঐ অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা বলি :

'সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রমাণ হলো — ধুতি-পাঞ্জাবি-চটি। বাঙালিকে এ-রকম পোশাক পরতে দেখেছি বহুবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। যাক। এখনো বাকি অনেক কিছু। মনোবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। নার্সিংহোমে ভর্তি করা দরকার।'

'বেশ তো।'

'পারো তো আগামীকাল একবার এসো।'

'আচ্ছা।' মিঃ চাড্ডা বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

রাত ন'টা। ডাঃ দীক্ষিতের চেম্বারে হাজির হলেন মিঃ চাড্ডা। দুজনে বসলেন মুখোমুখি।

'বুঝলে, শ্যামলাল!' ডাঃ দীক্ষিত বলতে শুরু করলেন। 'তোমার রোগীকে রাখা হয়েছে একটা বিশেষ কেবিনে। ভি. ডি. ও., টেলিভিশন—সব কিছু আছে চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে রেখেছি দুজন আইরিশ সুন্দরী। রোগীর সাজ পাল্‌টে পরানো হয়েছে পা-জামা আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। আজ সকালে কেবিনে ঢুকে দেখি, সে বিছানায় বসে আছে মুখ নিচু করে। আর বিড়বিড় করে বকছে। আমার দিকে সে মোটেই তাকাল না। তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে গলা খাঁকরি দিয়ে অল্প কাশলুম। বললুম—গুড্‌ মর্নিং মিস্টার। কোন কথা বলল না সে। শুধু উদাস দৃষ্টিতে আমাকে একবার দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। নার্সের কাছে জানতে পারলুম, যে প্রাতঃরাশ করেছে। জিগ্যেস করি, মিস্টার, ঘুমটুম কেমন হলো? সে উত্তর দেয় না। ফের জিগ্যেস করি, কী এত ভাবছো? সে এবার ফ্যালফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস ছাড়ে। আবার মুখ নিচু করে। আমার মনে হলো, বোধবুদ্ধি বুঝি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। আমি তখন তাকে হাসাবার চেষ্টা করি। একটা ছড়া কাটি: নীল পরীদের ডেরায় বসি কিসের এত ভাবনা! রূপের কাপে চুমুক দিতে হয়-না কেন বাসনা?'

শুনে, মিঃ চাড্ডা হেসে উঠলেন। 'বাব্বা, তুমি দেখছি রসিক ডাক্তার।'

'দিনরাত পাগল নিয়ে কারবার। একটু আধটু মজা না করলে ওরা আর-ও বিগড়ে যাবে যে—।'

'ঠিক বলেছো। অনেক ডাক্তারকে দেখেছি এ-রকম কৌতুক করতে। আচ্ছা, রঙ্গ-রসে কী রোগ সারে ?'

'সেরে যাবেই, নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে উপকার হয়। হাসলে, রোগী দেহ যন্ত্রণার কথা সাময়িক ভুলে যায়। দেহ-মন তেজালো হয়। হাসির ধমকে পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডের মাংস-পেশীর ব্যায়াম হয়। তাছাড়া যকৃৎ থেকে পিত্ত নিঃসরণ হয় বেশী মাত্রায়। এতে হজমশক্তি বাড়ে। জোরে হাসলে আর একটা সুফল মেলে—স্বাভাবিকের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশী অক্সিজেন ঢোকে ফুসফুসের ভেতর।'

'বাঃ বাঃ নিখরচায় উত্তম টনিক বটে। তা তোমার নীল পরীরা এ-রকম টনিক খাওয়াতে পারে না ?'

'পারে। পারে। সেজন্যই তো রেখেছি।' ডাঃ দীক্ষিত আবার হেসে উঠলেন। বললেন, 'যাক, শোন শ্যামলাল। আমার ছড়া শুনে যুবতী নার্সটির ঠোঁটে ফুটে ওঠে ঝিরঝিরে হাসি। কিন্তু তোমার রোগীর কোন ভাবান্তর হলো না। আমি কেন বাবার মত নয়—একই কথার জাবর কাটতে থাকে সে। আমি তো হাল ছাড়বার পাত্র নই, তুমি জানো। ফের একটা ছড়া কাটি : বাবার মত নও, এ-যে একটা ঘটনা / দুষ্টে করে নিন্দা-ঘৃণা-রটনা। বুঝি, কথাটা তার মনে লাগে। আড়চোখে আমার পানে তাকালো সে। তখন বলি, বাবার মত নও, এতে লজ্জা বা আফ-শোষের কী আছে ? এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। ভবিষ্যতে সুখ ও সমৃদ্ধি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। নাও। এক প্যাকেট সিগারেট তার বিছানায় ছুঁড়ে দিলুম। সে এক দৃষ্টিতে প্যাকেটের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হলো, তার স্মৃতি জাগছে। নার্সকে ইশারা করলুম। সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তার মুখে গুঁজে দিল। বাধা দিল না সে। আমি অগ্নিসংযোগ করে দিলুম। অবাক কাণ্ড সে লম্বা একটা টান মেরে নাক মুখ দিয়ে হুস হুস ধোঁয়া ছাড়ে। আমি তখন বেরিয়ে আসি।'

'তবে কী ধূমপানে ও অভ্যস্ত ?' মিঃ চাড্ডা প্রশ্নমাখা চোখে তাকালেন।

'দেখে, তাইতো মনে হয়। সিগারেট পেয়ে নেশা চাগড় দিয়েছে। তার মানে স্মৃতি ফিরে আসছে।'

'তাহলে সেরে যাবে, কী বলো ?'

'যাবে তো নিশ্চয়ই। তবে এখনো পর্যন্ত প্রহেলিকার জাল ছিঁড়তে

পারিনি। ভাবছি, ওকে সম্মোহিত করব। কাল সময় হবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক সকাল ন টায় কিন্তু।'

'ঠিক আছে।'

॥ তিন ॥

ব্লু ভিউ নার্সিং হোমের প্রধান ফটকের সামনে একটা ঝকঝকে খয়েরি রঙের ফিয়াট এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামলেন মিঃ চাড্ডা। আর তখনই সাইরেনের তীব্র ধ্বনি শোনা গেল। ফটকের পাশে দাঁড়ান এক গুর্খা দারোয়ান তার জঁাকাল গোঁফে তা দিতে দিতে অভিবাদন জানাল মিঃ চাড্ডাকে। মিঃ চাড্ডা সহবত জানিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। বলতে গেলে অনেকদিন পরেই এলেন বন্ধুর নার্সিংহোমে। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত। পুরনো অট্টালিকার ভোল বদলে গেছে একেবারে। যে কোন ব্যক্তির নিকট রূপকথার ইন্দ্রপুরী বলেই ভ্রম হবে। পুরোটাই শীততাপনিয়ন্ত্রিত। স্বয়ংক্রিয় লিফটগুলো উঠছে-নামছে। নীল পাথরের মেঝে যেন আয়না। পাঁচিলের গায়ে গাঢ় নীল রঙের প্রলেপ। সোনালি-নীলের মায়াবি আলো ছড়ানো। তিনি দরজা ঠেলে ডাঃ দীক্ষিতের ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার টাই-এর নট আল্‌গা করতে করতে হাত-ঘড়ির দিকে তাকালেন। হেসে বললেন, 'খুব পাংচুয়াল তো। বসো।'

মিঃ চাড্ডা ডাক্তারের সামনের চেয়ারে বসলেন। তিনি ঘরের ভেতরটা দেখছিলেন। টেবিলের ওপর ছোট নটরাজের পাথুরে মূর্তি। ফিকে নীল। ঘরটির সর্বাঙ্গে নীলের মায়া জড়ানো। টি ভি. থেকে শুরু করে কম্পিউটার পর্যন্ত সর্বাধুনিক সাজ। শ্বেতবর্ণা সেবিকারা চলাফেরা করছে নানা কাজে। 'এ যে স্বপ্নরাজ্য।' মিঃ চাড্ডা বলেন।

ডাঃ দীক্ষিতের ঠোঁটে মৃদু হাসি।

সেই সময় এক বেয়ারা ঘরে ঢোকে। হাতে তার ট্রে। তাতে দু'কাপ কফি। টেবিলের ওপর কাপ নামিয়ে রেখে সে বেরিয়ে গেল।

পেয়ালার দিকে তাকিয়ে মিঃ চাড্ডার বিস্ময় বাগ মানে না। গাঢ় নীল রঙের চকচকে পেয়ালা। একপাশে ফালি চাঁদ আর ডানাযুক্ত পরী। যেন চাঁদের দেশে ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে, এমন জীবন্ত। 'তোমার

পছন্দ আছে হে। নীলের যেন হাট বসিয়েছ। ঘরে-বাইরে নীল পরীর দল।' মিঃ চাড্ডা তারিফ না করে পারলেন না।

ডাঃ দীক্ষিত মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, 'তুমি তো ইলেকট্রনিকের ব্যাপারি। তোমায় একটা জিনিস দেখাচ্ছি। তিনি স্টিলের আলমারি খুলে একটা যন্ত্র বের করলেন। মাঝারি সাইজের ট্রানজিস্টার রেডিও-র মতন। টেবিলের ওপর রাখলেন। 'বলতো, এটার মধ্যে কী জাদু আছে?'

মিঃ চাড্ডা যন্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। 'বাঃ ভারি চমৎকার ডিজাইন তো! আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তোমার ডাক্তারির যন্ত্র-টন্ত্র হবে।'

'ধরেছো ঠিকই।' ডাঃ দীক্ষিত বলেন, 'মনঃশক্তি রেকর্ড (**Mind Power Records**)। সম্মোহন-চিকিৎসায় লাগে। আমারই আবিষ্কার। ভারি মজার যন্ত্র। কথা বলতে পারে। চলো দেখবে।'

দু'জনে রোগীর কেবিনে ঢুকলেন। যুবকটি তখন বিছানায় বসে আছে গুম হয়ে। এক নীল-নয়না তার পাশে দাঁড়িয়ে। তার বাঁ হাত রোগীর ঘাড়ে রাখা। ডান হাতে ব্রুশ দিয়ে রোগীর চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে মিঃ চাড্ডা চাপা স্বরে বলেন, 'রোগী দিব্যি বহাল-তবিয়েতেই আছে দেখছি।' শুনে নার্সটি হেসে ফেলে। সদ্য-ফোটা কচি রোদের মতো মিষ্টি যে হাসি।

নার্স দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। রোগীকে একটা নরম গদি-আঁটা আরাম-কেদারায় বসান হলো। ঘরের আলো নিবে গেল। শুধু একটা কম-পাওয়ারের নীল বাল্ব আলো ছড়াতে থাকে। বিষণ্ণ যুবকের মুখে সে আলো গড়িয়ে যায়। সমস্ত ঘর কীরকম মায়াময় হয়ে ওঠে নীলচে অনুজ্জ্বল আলোকে। নার্সটি চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। রোগীর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডাঃ দীক্ষিত স্বয়ং। রোগীর চোখের ওপর তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে মোহিনী মায়া। তাঁকে সে-ভাবে তাকাতে আগে কখনো দেখেন নি মিঃ চাড্ডা। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাঃ দীক্ষিত তাঁর দু'হাতের আঙুলগুলো ঈষৎ ফাঁক করলেন। তারপর কাঁপাতে কাঁপাতে রোগীর দেহের ওপর দিয়ে বারবার হস্তচালনা করতে থাকেন। মিঃ চাড্ডা গভীর মনোযোগে দেখছেন ডাক্তারের অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ। ঘরের বাতাস তখন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। নীরব নিস্তব্ধ। সহসা ডাক্তার মনঃশক্তি রেকর্ড চালু করে দিলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে উচ্চারিত হয়,

'আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয়—তোমার ঘুম আসছে—ঘুম—ঘুম—ঘুম। তুমি চোখ বোজ– তুমি ঘুমাও—আনন্দে ঘুমাও—ঘুম—ঘুম—ঘুম— ।' রোগী নিস্পন্দ। সে এলিয়ে পড়ে। তার মাথা পিছনে ঝুঁকে পড়ে। নার্সটি দ্রুত হাতে মাথা ধরে ফেলে। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে রোগী। ডাক্তার ফিসফিসিয়ে বলেন, 'যাক কাজ হয়েছে। ও এখন সম্মোহিত'। মিঃ চাড্ডা সত্যই যেন জাদু দেখছিলেন। তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন ডাঃ দীক্ষিত। নিজেও চেয়ারে বসলেন। মনঃশক্তি রেকর্ড বন্ধ করে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিলেন। অতঃপর ডাঃ দীক্ষিত দ্রুত প্রশ্ন করতে থাকেন :

'তোমার নাম কী ?'

'মানু। মানবেন্দ্র বিশ্বাস।'

'বাবাব নাম ?'

'চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস।'

'মা ?'

'সুজাতা।'

'দেশ ?'

'পূববাংলা। অধুনা বাংলা দেশ।'

'এখন কোথায় থাকো ?'

'ভবানীপুব, কলকাতা।'

'বেশ। তোমার কথা সংক্ষেপে বলো।'

॥ চার ॥

ঠিক সংক্ষেপে নয়। মানু ঘোরের মধ্যে অনেক কথাই বললে। কখনও সজ্ঞানে কখন-ও আচ্ছন্নভাবে সে অনেক কথাই বলেছে। একদিনে নয়, প্রতিদিন একটু একটু করে। দীর্ঘ কাহিনী। অসংলগ্নভাবে বলেছে, আমরা সেই কাহিনী গুছিয়ে তারই বয়ানে লিখছি।

'শান্তি নিলয়'। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রূপরম্য বাড়ি একটি। তিনতলা। বাইরের দেয়ালে নানা মাপের নানা রঙের পাথর বসান। তাতে বিচিত্র কারুকাজ। সামনে অনেকখানি সবুজ জমি। মাঝখানে কৃত্রিম জলাধার। মধ্যে দ্বীপের মতন একটা সুদৃশ্য পাথরের স্তম্ভ। সেটার ওপরে

এক সাদা সিংহীমুখ নারীমূর্তি। তার মুখ ফোয়ারা দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝিরঝির করে জল আধারের ওপর ঝরে পড়ে। দিনমানে ঝিকিমিকি শীকরে সাত রঙা রামধনু প্রতিবিম্ব রচনা করে। রাত্রিবেলা প্রাসাদের ভিতর থেকে আলোর বৃন্তে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব মায়াবী দৃশ্য। তবে সে ইমারত আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষে হঠাৎ-ই গজিয়ে ওঠেনি। তার পিছনে ছিল গায়ের রক্ত জল-করা ইতিহাস। ব্যবসা-বাণিজ্য করে দিন কেটে যাচ্ছিল বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে। অকস্মাৎ একদিন মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলো ভয়ংকর রূপ নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে। হত্যা, অত্যাচার, ধর্ষণ, নিগ্রহের প্রচণ্ড ঝড়। সেই ঝড়ের মুখে 'শান্তি নিলয়' ভেঙে নচনচ হয়ে গেল। এলো দেশ-বিভাগের নিষ্ঠুর ধাক্কা। বাবার পায়ের নিচে মাটি গেল সরে। দেশত্যাগের হিড়িক। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাবা কোন-মতে নিজের প্রাণটি নিয়ে সপরিবারে এসে ঠেকলেন এপার বাংলায়। সালটা উনিশ শ' সাতচল্লিশ। বিপর্যয়েব কাবণ খুঁজতে গিয়ে নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিলেন তিনি।

উদ্যোগী পুরুষের সুযোগের অভাব হয় না। বাবা সে-সুযোগের সদ্ ব্যবহার করে আবার গড়ে তুললেন তাঁর ভেঙে-পড়া সংসার। এপার বাংলায় গড়া সংসার আবার গেল ভেঙে। ভাঙা আব গড়া—এই তো প্রকৃতির খেলা।' বলতে বলতে মানু থেমে যায়। ডাঃ দীক্ষিত তৎক্ষণাৎ বলেন 'তারপর'?

মানু বলতে থাকে, 'অজানা জায়গা। আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে শেষে বাবা উপস্থিত হলেন রতনপুবে। হুগলি জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঘটনাচক্রে বাবার আলাপ হয় সেই গ্রামেব বাসিন্দা বিপ্লব বসু ওরফে বিপুর সঙ্গে। দিদিরা তাঁকে কাকু বলে ডাকতেন। শুনে শুনে ছোটবেলা থেকে আমি-ও তাঁকে কাকু বলতে শিখি। কাকুর বাগান-বাড়িতে প্রথম আস্তানা গাড়েন বাবা। একতলা বাড়ি। তত আহামরি না। তবে বিনা-ভাড়ায় বাড়িটা পেয়ে মা খুব খুশি। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল ঘেরা।

আমার ছোট বেলায় মা কত গল্প বলতেন। আর আমি অবাক হয়ে শুনতাম। শুনেছি, নিত্য সন্ধ্যের পর কাকু এসে পুকুরের জলে হাত-পা-মুখ ধুতেন। তারপর ঘাটে বসে খানিক জিরিয়ে নিতেন। মা তখন চা এনে তাঁকে দিতেন। চায়ের সঙ্গে থাকত মুড়ি আর হাতে গরম পিয়াজি-আলুর

চপ-বেগুনি। কাকুর প্রিয় খাদ্য। খুব তৃপ্তি সহকারে খেতেন তিনি।

বাগান-বাড়ি থেকে দু'পা হেঁটে গেলেই কাকুর নিজস্ব বাড়ি। দোতলা। রঙচঙে। বাড়ির ছাদ থেকে বাগান-বাড়ির সব-কিছু দেখা যায় স্পষ্ট। তাঁদের সুখের সংসার। বসন্ত বসু তাঁর দাদা। ভদ্র বিনয়ী। কমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমরা তাঁকে জেঠুমণি বলে ডাকতুম। কাকিমা কিন্তু অসম্ভব রাশভারি। ভীষণ জেদী আর একটু শৌখিন। সব দিক থেকে দারুণ চেহারা। কাকুর সাথে তেমন বনিবনা ছিল না। বিয়ের সাত-আট বছর পরেও কাকিমা কোন সন্তানের জননী হতে পারেন নি। হয়তো-বা সেই কারণেই।

জেঠুমণি মস্ত বড় ব্যবসায়ী। তাঁর গোলদারি দোকান। চুন-সুরকি ইটের একচেটিয়া কারবার। রেশনের দোকান, কাপড়ের দোকান—কত-কি। আবার জমি-জমাও বিস্তর। চাষ-আবাদের দেখাশোনার পুরো ভারটাই ছিল কাকুর ওপর। যাই হোক, আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে জেঠুমণি তাঁর সংস্থায় বাবাকে একটা চাকরি দেন। তিনি বাবার ওপর খুবই সদয় ছিলেন। এই পুনর্বাসনের সুযোগ এসেছিল কাকুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। দিন বেশ গড়গড় করে চলে যাচ্ছিল। ঝামেলা বিশেষ ছিল না।

মায়ের মুখে আরো শোনা: প্রথম প্রথম কাকুর বাড়ির সবাই আসতেন বাগান-বাড়িতে। জেঠুমণির ছেলে-মেয়েরা, দিদিদের সাথে খেলা-ধূলা করতেন। সারা বাগান তোলপাড় করতেন তাঁরা। বাড়ি মুখর হয়ে উঠত তাঁদের হৈ-চৈ আর দাপাদাপিতে। কাকুর বাড়ি ছিল আমাদের আনন্দের খনি। দু'পরিবারের মধ্যে গড়ে উঠেছিল স্নেহপ্রীতি আর ভালবাসার বুনিয়াদ। তারপর কী হলো কে জানে; মা ক্রমশ ওদের হাবভাব চালচলনে বুঝতে পারলেন যে ওরা আমাদের আর তত পছন্দ করছেন না। তাই মা-ও শেষে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন।

শেষ বোশেখের একদিন। বাইরে তখন মিহি অন্ধকার। গাছ-গাছালির মাথা থেকে আলো যাচ্ছে মুছে। রঙ-বেরঙের পাখিরা গাছের চারদিকে চক্কর দিয়ে ডালে-ডালে বসছে। ডানা-ঝাপটানির শব্দ ভেসে আসছে। এদিকে তখন গরম-ও পড়েছে প্রচণ্ড রকম। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। প্রকৃতি যেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় কাকু এলেন একেবারে ঘামে ভিজে। ঘাটের ধাপে আয়েস করে বসলেন পুকুরের দিকে

মুখ করে। মা তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পাতিলেবুর সরবত এনে দিলেন। কাকু চোঁ চোঁ করে খেয়ে পাশে গ্লাসটা রাখলেন। মা তাঁর পাশে বসে হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকেন। হঠাৎ চুড়ির টুং টাং শব্দ। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, এক ধাপ উঁচুতে কাকিমা দাঁড়িয়ে। পাত-পাখা কাকুর মাথায় ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ল গ্লাসের ওপর। ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল গ্লাস। মা নির্বাক। তিনি শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কাকুও অপ্রস্তুত।

কাকিমা দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখদুটো যেন ধক করে জ্বলে ওঠে। তাঁর দীর্ঘ দেহ একটু দুলে ওঠে। তিনি শাড়ির আঁচলটা টেনে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিলেন। অতঃপর শোনা গেল তাঁর ভারি গলার আওয়াজ—'আমি কী বাতাস করতে জানি না? নাকি সরবত চাইলে বাড়িতে পেতে না?'

কাকু বিব্রত বোধ করেন আর কাকিমার মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'বেশ, রাতের আহারটা এখানেই সেরে নিও।' পারতো ঘুমটা-ও। আমরা আর অপেক্ষা করবো না।' তিনি দুমদুম্ শব্দে হঠাৎ চলে গেলেন। কথাগুলো যেন চাবুকের মতো মায়ের সর্বাঙ্গে আঘাত করে।

কাকিমা চুপচাপ রইলেন কিছুদিন। হয়তো কাকুর সাথে কিছু বোঝাপাড়া হয়ে থাকবে। মা'র কিন্তু দিন কাটে রীতিমতো উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়। দেখতে দেখতে কেটে যায় কয়েকটা মাস। অসহ্য গরমের পর নেমে আসে বর্ষার ধারা।

সেদিন সকালে, এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। তবুও আকাশে কাটেনি মেঘের ঘোর। বুঝি-বা শুরু হবে বৃষ্টি। বইছে ঝড়ো হাওয়া। উঠোনে প্যাচপ্যাচে কাদা। ঝড়ে আমগাছের মস্ত বড় একটা ডাল ভেঙে পড়েছে সেই সকালে। মাটিতে ওলোট-পালট খাচ্ছে সেটা। কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে কাকের কয়েকটা বাসা। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেকগুলো ডিম। বাবা তখন জেঠুমণির দোকানে। দিদিরা স্কুলে। কাকু এলেন। হাতে তাঁর একটা টাটকা ইলিশ। মস্ত বড়। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বৌদি শিগগির এসো।'

মা তখন রান্নাঘরে। সেখান থেকেই সাড়া দিলেন, 'কেন? কী হয়েছে?'

'বাইরে এসেই দেখ না'।

মা শাড়িতে হলুদ-মাখা হাত মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'নাও, ধর। উঃ হাত ভেবে গেছে।'

ইলিশ দেখে মা'র মনে পুলক জেগে ওঠে। চকিতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পদ্মার ইলিশ। দেশে থাকতে তিনি কত ঘটা করে রান্না করতেন যে—। কত রকম পদ—ইলিশ ভাজা, সর্ষে ইলিশ, ইলিশের ভাপা, ইলিশের অম্বল। কাকু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এতো ভাবছো?'

মুখে একটা হাল্কা হাসি ছড়িয়ে মা বললেন, 'ভাবছি, এতো মাছ খাবে কে? বরং অর্ধেকটা কেটে দিই। বাড়ি নিয়ে যাও।'

কাকু বললেন, 'বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে কী এখানে এনেছি? দুপুরে এখানেই খাবো। রান্না করো, দেখি। হ্যাঁ, আর-একটা কথা। খিচুড়ি-টিচুড়ি হলে এই বাদলায় জমতো ভাল।'

মা'র মুখে অমনি ঝরঝরে হাসি। 'বেশ তো। বাড়িতে সবই আছে।'

'তবে তো, তোফাই হবে। নাও তাড়াতাড়ি করো। ঘুরে আসছি।'

মা আমতা আমতা করে বললেন, 'মুশকিলে ফেললে, ঠাকুর পো।'

'মুশকিল কেন?'

'বাড়িতে কী কৈফিয়ত দেবে? জা'য়ের মুখনাড়া খেতে হবে না?'

'সে তোয়াক্কা করে না এই শর্মা। বুঝলে?' তিনি বললেন, 'তোমায় ভাবতে হবে না। সবাই জানে আজ বাড়িতে খাবো না। মিত্তির-বাড়ি ছাদ্দের নেমন্তন্ন।'

হাসতে লাগলেন।

দুপুরে আহারে বসলেন কাকু। মা পরিবেশনে ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। কাকু চট করে জাপটে ধরে ফেললেন। তড়িঘড়ি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মা'র কপাল বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। জানলার ধারে ছিল হাত-পাখা। সেটা নিতে গিয়ে কাকুর নজর বাইরে আটকে গেল। অবাক কাণ্ড। শাড়ির আঁচলের মতো কি যেন ছিটকে সরে গেল। তাঁর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তবে মা'র আকস্মিক অসুস্থতার জন্যে তিনি এতই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, সে-ব্যাপারে মনোযোগ দেবার অবকাশ পেলেন না। মা'র চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। বাতাস দিলেন। তবেই মায়ের হুঁশ ফেরে। উঠে বসলেন। কাকু কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলেন। মা সবটুকু জল খেলেন। কাকুর আহারে ব্যাঘাত ঘটাবার

জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'কী জানি, হঠাৎ কেন মাথাটা ঘুরে গেল। কিছু মনে করো না, ঠাকুরপো। নাও, খেয়ে নাও।'

মা'কে আশ্বস্ত করে কাকু বললেন, 'না না। মনে করার কী আছে ? তোমার শরীর দুর্বল, হয়তো তাই— ।'

কাকু হাত ধুয়ে ফের আহারে বসলেন। খিচুড়িব ভুরভুর মিষ্টি গন্ধে তখন সমস্ত ঘরখানি ভরপুর। সেই গন্ধে কাকুর খিদেটা চনমন করে ওঠে। খুব আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকেন তিনি। এমন সময় হই-চই শোনা গেল। পরক্ষণে দুড়দাড—দমাদ্দম—দমাদ্দম শব্দ। কাকু ত্রস্ত হলেন। তিনি কান পেতে শুনলেন। বললেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের বাড়িব দিক থেকে।'

আধ-খাওয়া অবস্থায় কাকু উঠে পডলেন। মা তাঁব হাত ধরে এক-রকম জোর করেই বসিয়ে দিলেন। 'ও কিছু না। ডালপালা ভেঙে পডার শব্দ।'

কাকু তখন গোগ্রাসে গিলতে শুরু কবলেন। ইলিশে হাত পড়ল না দেখে মা জিগোস করলেন, 'মাছ খাচ্ছো না যে— ?'

কাকু হাত নেডে বললেন 'গলায় কাঁটা বিঁধবে। থাক, পরে খাবো।'

'তাই হয় নাকি ? কাঁটা বেছে দিচ্ছি খেয়ে নাও।'

আহারান্তে কাকু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মা তাঁব হাতে জল ঢেলে দিলেন। কোঁচায় হাত-মুখ মুছতে মুছতে কাকু দিলেন দৌড়।

কাকু চলে গেলেন। মা-ও আহাবে বসলেন কিন্তু তাঁর তেমন রুচি হলো না। কেমন যেন বিস্বাদ সব—অমন খিচুড়ি, এমন কি মাছটা-ও। দু'চাব গ্রাস খেয়েই তিনি উঠে পডলেন। এঁটো-কাঁটা সাফ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললেন তিনি। কানে আসছিল নানা কণ্ঠের অস্পষ্ট কোলাহল। কাকুর বাড়িতে বিপদের আশংকা করলেন। তাঁর বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির ঘা পডতে থাকে। উদ্বেগে, আশংকায় তিনি অস্থিরভাবে ঘরবার করতে থাকেন। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে না পেরে তিনি কাকুর বাড়ির পানে পা বাডালেন শেষে।

কাকুর বাড়ি তখন লোকে লোকারণ্য। অনেকক্ষণ ধরেই একটা জমাট ভীতি মায়ের বুকের কোণে আটকে ছিল। তত লোক একসাথে দেখে তাঁর মনটা ছ্যাঁক করে ওঠে। কাউকে কোন কথা জিগ্যেস করার সাহস হয় না। বড় ঘোমটা টেনে তিনি সন্তর্পণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

আশ্চর্য কাণ্ড। কাকুর ঘরের অমন সেগুন কাঠের দরজা ভাঙা। একপাশে পড়ে আছে একটা মস্তবড় ঢেঁকি। দরজার সামনে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। তিনি ঘরের ভেতরে উঁকি দিলেন। কাকিমা মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একেবারে বেহুঁশ। মুখে তাঁর কাদার ছিটে। কাপড়-জামা ভিজে, কাদায় মাখামাখি। সায়ার ডুরি ঢিলে করা। ব্লাউজের হুক-ও আলগা-করা। মেঝেয় ছড়ানো দড়ি। কাকু একপাশে বসে আছেন। তাঁর মুখখানা থমথমে। অরবিন্দ ডাক্তারবাবু কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিচ্ছেন কাকিমাকে। ফটাফট সূচ ফোটাচ্ছে তাঁরই কম্পাউণ্ডার। এ-রকম একটা করুণ দৃশ্যের জন্যে মা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মুহূর্তে তিনি ফানুসের মতো চুপসে গেলেন। তাঁর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তিনি দরদর করে ঘামতে থাকেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠোনে নেমে এলেন। সেখানে জেঠিমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছিলেন। মা'কে দেখে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মা-ও চোখের জল আটকাতে পারলেন না। সে-রকম মর্মভেদী দৃশ্য মা আদৌ সহ্য করতে পারেন না। সিনেমায় মারামারি-কাটাকাটির দৃশ্য দেখে একবার তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যান। তাঁর স্নায়ুতন্ত্র ভীষণ দুবল। এ-রকম মর্মান্তিক ঘটনা যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাঁর মাথা গেল ঘুরে। নিজেকে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। সদর দরজার সামনে কয়েকজনের গুলতানি চলছিল। দেখতে পেলেন ভজাকে। কাকুর বাড়ির পরিচারক। চাপাস্বরে সে কি যেন বলছিল। মা কান খাড়া করলেন। ভজা বলছিল, 'সবার আগে আমিই তো···। আলুথালু,···পাগলের মতন,··· বৃষ্টির মধ্যে। বাগান বাড়ি···। ঘরে,···দড়াম করে,···এঁটে। সন্দেহ হলো। ডাকলুম। সাড়া নেই। প্রথমে টোকা, পরে ধাক্কা। নাঃ···। হাঁকাহাঁকি···।' শুনে মা'র সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। তিনি বাড়ির দিকে পা চালালেন। পা যেন আর উঠতে চায় না। শরীর ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত। টলতে টলতে কোন রকমে বাড়ি ফিরলেন।

সে-যাত্রায় কাকিমা রক্ষা পেলেন ভজার সময় মতো হস্তক্ষেপে আর অরবিন্দ-ডাক্তারের সুচিকিৎসায়।

এক দুপুরে। বাইরে তখন কাঠ-ফাটা রোদ। খাওয়া-দাওয়া সেরে মা এঁটো বাসন কলতলায় ডাঁই করে রাখছেন। বাবা বাড়ি ফিরলেন। এ-সময় তাঁকে ফিরতে দেখে মা একটু অবাক হলেন। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে তিনি প্রায় দৌড়ে এলেন। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাবার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ নিষ্প্রভ। মুখ শুষ্ক। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ?' বাবা নীরবে বিছানায় শুয়ে পডলেন। তাঁর সারা দেহ তখন ঘামে জবজব করছে। মা গামছা দিয়ে তাঁর মুখ-গলা মুছিয়ে দিলেন। হাত-পাখার বাতাস কবলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। মা নিচু স্বরে ফের জিগ্যেস করলেন, 'শবীর খারাপ?'

বাবা অস্ফুটে বললেন, 'জ—ল।'

মা এক গ্লাস জল এনে দিলেন। বাবা আধশোয়া অবস্থায় কয়েক ঢোঁক মাত্র খেলেন। আবার শুয়ে পডলেন। মা জানালার পাল্লা দুটো খুলে দিলেন। এক ঝলকা গবম হাওয়া ঢোকে। বাবা বিডবিড় করে বললেন, 'এবার থেকে গাছতলায় শুতে হবে।' তাঁর মুখখানি ভয়, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন।

মা শুনলেন। তবে তার অর্থ ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারলেন না। 'কী বলছো?' তিনি বাবাব মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁডালেন।

বাবা নিজের কপালে করাঘাত করলেন। 'ভগবান ভবসা।'

মা রীতিমত ভীত হলেন। 'কী সব আবোল তাবোল বকছ?'

'ঠিকই বকছি। আজ থেকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত।'

'তার মানে?'

'মানে সোজা।' বাবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'বসন্তদা চাকরিতে জবাব দিয়েছেন। উঃ গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু জল—।'

মা ফের গ্লাসটা বাবার হাতে দিলেন।

'কেন?'

'আমি নাকি তাঁর পুঁজি ভেঙেছি।' বাবা বললেন, 'এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। এক হপ্তার মধ্যে।' চোখে তাঁর ক্ষোভ আর হতাশার প্রকাশ স্পষ্ট।

শুনে, মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তাঁর বাকস্ফূর্তি হয় না। তখন তাঁর স্মৃতির জানলা গেল খুলে। মনে পড়ে ওপার বাংলার ভিটেখানি। কী বিশাল অট্টালিকা। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ভরা বাগিচা। কী না ছিল তাঁদের। তাঁর চোখের কোণায় গড়িয়ে পড়ে

ছ'ফোঁটা অশ্রু। সেই মুহূর্তে তাঁর সুপ্ত তেজ যেন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। তিনি ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো ফুঁসে ওঠেন। 'কী? অকারণে অপবাদ! প্রতিবাদ করতে পারলে না? সহ্য করলে?'

'তাছাড়া উপায় কী? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া।'

'দোষ নেই—নিরপরাধী—অমনি তাড়িয়ে দিলেই হলো? অত সোজা? আসুক ঠাকুরপো।' মা উত্তেজিত হলেন।

বাবা তখন ক্লান্ত, তিক্ত বৈরাগ্যে আড়ষ্ট। 'নাহ্ চলেই যাব। ভাল্লাগে না। অপমানের বোঝা আর বইতে পারি না। আজকাল মানুষজন কেমন যেন বদলে গেছে। চলেই যাব—।'

মা চুপ করে গেলেন।

সেদিন। বিকেলের রোদ প্রায় মরে এসেছে। পাতাবাহার গাছের ফাঁক দিয়ে গোটা কয়েক ফিঙে ফুরৎ করে উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিকের কিচির-মিচির শব্দে শিমুল গাছ চমকে ওঠে। বাবা স্থির হয়ে বসে সব দেখছিলেন। তাঁর চোখে অসহায়তাবোধের ঘন ঘোর। নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে তাঁর চেতনা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে। মাও তখন অনিশ্চিত ভাবীকালের আশংকায় থরথর। কাকু এলেন। ধপাস করে বিছানায় বসলেন। তাঁর সমস্ত মুখ অমানিশার কালিমা মাখা। মাথা জোড়া মরুদ্যানে যা কয়েক-গাছা অবশিষ্ট, তা-ও অবিন্যস্ত। তাঁর ললাটে চিন্তা-রেখা স্পষ্ট। কয়েক দিনের মধ্যে যেন তাঁর বয়স বেশ বেড়ে গেছে। কাকু বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কেন যে এ-রকম হলো, কিস্যু বুঝতে পারছি না। দাদা তো সে-রকম মানুষই নন। হঠাৎ মাথাটা বিগড়ে গেল কেন যে—! কেউ উস্কানি দিয়েছে, নিশ্চয়।'

'আমার ভাগ্যের দোষ। কপালের গেরো। কর্মফল। কথায় বলে—অভাগা যদ্যপি চায় / সাগর শুকায়ে যায়।' বললেন বাবা। অভিমান ও ক্ষোভে মেশানো কণ্ঠস্বর।

মা কী একটা বলতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। কান্নার দলা এসে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিল।

। কাকু অভয় দিয়ে বললেন, 'মুসড়ে পড়লে হবে না। শক্ত হাতে ধৈর্য ধরে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এ-জীবন একটা নদীর মতো। কখনো জোয়ার কখনো ভাটা। তার বিচিত্র গতি।'

বাবা শুষ্ক হাসলে! 'মোকাবিলা? হায়, নিজের ভিটেটাই হাত-ছাড়া। মোকাবিলা করতে পারলুম কই? এ তো কাকের বাসায় কোকিল।'

কাকু চুপ করে গেলেন। বার কয়েক বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, দেখি, কী করতে পারি।' তিনি উঠে পড়লেন।

আকাশে তখন তারা ফুটছে একটা দু'টো করে। দূরের কোন বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ আসে ভেসে। মায়েব খেয়াল হলো। তড়িঘড়ি কাপড় ছেড়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকলেন। শাঁখে ফুঁ দিলেন। তেমন বাজল না।

সে-রাতে মা রান্না-বান্না কবতে পারলেন না। তাঁর সারা শরীর জুড়ে কেমন যেন একটা অবসাদ। দিদিবা চালভাজা খেয়ে শুয়ে পডলেন। মা অভুক্ত থাকেন। সেই সঙ্গে বাবা-ও। অবসন্ন দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলেন তিনি। অনেক চেষ্টা করেও চোখেব পাতা এক করতে পারলেন না। অস্বস্তিতে এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকেন। রাশি রাশি আজব-চিন্তা এসে তাঁর মগজ দখল করে। ক্রমে তাঁর মাথা ভারি হয়ে ওঠে। তিনি উঠে বসেন। ঘরের কোণায় তখন হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো। সেই আলোকে বাবাকে এক ঝলক দেখে নিলেন তিনি। দিব্যি ঘুমোচ্ছেন অঘোরে। মুখে শুধু করুণ ছোপ। মা বারান্দায় বেবিয়ে এলেন নিঃশব্দে। নিশুতি রাত। পাতা চুঁইয়ে টপটপ কবে জল পডে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। গাছ-গাছালিব ঘন সন্নিবেশে চাবপাশ ঝাপসা ঠেকে। চাঁদনি রাত বলে মনেই হয় না। ডানা নাড়ার ঝটপট আওয়াজ ওঠে। এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেল। কত কথা কত স্মৃতি মা'র মনের ভেতর দিয়ে বাদুড়ের মতো উড়ে যায়। সবে বিয়ে হয়েছে। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনি ছাদে যেতেন। বাবার মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। ওপরে তারার নকসা-কাটা আকাশ। চাঁদ বসেছে রাজসভায়। নিচে ছাদভর্তি টবে ফুল। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। 'শান্তি-নিলয়' যেন স্বপ্নপুরী। গল্পে গল্পে রাত ভোর হয়ে যেত। সেদিনের সে-সব কথা মনে পড়ায় মা'র মন আরো বিষাদে ভরে ওঠে। পাখির কলস্বরে ঘোষিত হয় নিশা-উষার সন্ধিক্ষণ। পুব গগনে রঙ-বদলের আভাস। মা উঠে পড়লেন।

পরদিন। ঝলমলে সকাল। কাকু এলেন। হাতে তাঁর কচুপাতায় মোড়া কিছু কুঁচো চিংড়ি। মা'কে বললেন, 'নাও বৌদি, চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে তৈরী থেকো।' তিনি বলেন, 'দাদার কাছে দরবার করে-ও কোন সুরাহা হলো না। বাড়ি ছাড়তে হবে আজই। একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ।'—'আজই' শব্দের ওপর অস্বাভাবিক জোর। মা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। কাকু আশ্বস্ত করে বললেন, 'অত কী ভাবছো? যা হয়-একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তৈরী থেকো।' তিনি বিদায় নিলেন।

উপোস গেছে রাতভোর। দিদিরা তো খিদেয় অস্থির। তাদের গুড়-মুড়ি দিলেন মা। বাবা চা ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। মা ভাত চড়িয়ে দিলেন।

দুপুরের আগেই আহারে বসলেন বাবা। সঙ্গে দিদিরা। খেতে খেতে বাবা বললেন, 'চমৎকার!' সেদিন যা রান্না হয়েছিল, তা এমন-কিছু আহামরি না। গলা ভাত আর পাতলা মুসুরির ডাল। সর্ষের তেল-মাখা আলুসেদ্ধ আর পিঁয়াজ। আর ছিল চিংড়ি দিয়ে কুমড়ো শাক। বাবা সবই খেলেন। অভাবের সংসার। যা জুটেছে তাই খেতে হবে। সবশেষে মা বসলেন আহারে। রাত থেকে তিনি দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটেন নি। কিন্তু তাঁর মুখে খাবার বিস্বাদ লাগে। গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। অনেকটা ফেলে ছড়িয়ে শেষে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন।

বলতে বলতে মানু হঠাৎ চুপ করে গেল। ডাঃ দীক্ষিত তখন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'বলে যাও।'

মানু বলতে থাকে: 'ঘরের জিনিসপত্তর যা ছিল সবই গুছিয়ে নিয়ে পোটলা-পুটলি বাঁধতে শুরু করেন বাবা-মা দু'জনে মিলে। জিনিস কী-ই বা ছিল গরিবের ঘরে। সামান্য বাসন-কোসন, বিছানা, একটা তোলা উনুন আর একটা কেরোসিন-স্টোভ। ঠাকুর-ঘরের জিনিসগুলো আলাদা ক'রে বেঁধে নিলেন মা। তার মধ্যে ছিল রাধাকৃষ্ণের একটা ছোট্ট বাঁধানো ছবি, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের ছবি, শাঁখ, পিলসুজ, পিদীম আর খানিকটা পেঁজা তুলো। হ্যারিকেন চারটে দিদিরা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। একটা কাঠের খাট। ঘুন-ধরা। অসার। বোধ হয় আম কাঠের। একটা না-পালিশ টেবিল। আর দুটো চেয়ার। বাবা-মা ধরাধরি করে সেগুলো উঠোনে নামালেন। আর তখন মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। স্বাভাবিক।

কাকু এলেন অপরাহ্নের রোদ মাথায় করে। তাঁকে এক গ্লাস পাতিলেবুর সরবত দিলেন মা। 'ঠাকুরপো! কোথায় যাব?' মা শুধালেন ধরা গলায়।

'পি ডবলিউ ডি'-র বাংলোয়। খালিই পড়ে আছে। বেশী দূর না।'

একটা গরুর গাড়িতে মালপত্তর বোঝাই করা হলো। গাড়িখানা ভর্তি হয়ে যায়।

রাস্তা বেয়ে গাড়ি চলেছে গড় গড করে। তখন রোদের তেজ অনেকটা কমে গেছে। তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। রাস্তার ধারে ঝক-ঝকে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলো-বাড়ি। কাঠের গেট খুলে তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন। ইটের পাকা গাঁথুনি। তিন-কামরার একতলা। উঁচু খোলা বারান্দা। চারদিক ইটের পাঁচিল ঘেরা। কোমর-সই উঁচু। বাড়ির সামনে ফুলভরা সাজানো বাগান। গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা-ফুল সুবাস ছড়াচ্ছে। লাল-বাগুা নয়নতারা শোভা মেলে ধরেছে। বাড়িতে একটা টিউবওয়েল আর একটা পাতকুয়ো অর্থাৎ পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। বারান্দায় দাঁডিয়ে চারপাশ ভালভাবে দেখা যায়। কাছে-পিঠে কোন বসতি নেই। শান্ত নির্জন শান্তিময় পরিবেশ। বাবা নিশ্চিন্ত হলেন।

দিন ফুরায়, সন্ধ্যা নামে, ঘনিয়ে আসে রাত। স্টোভে মুসুরের খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন মা। মুখোরোচক করার জন্যে তিনি বরাবরই মশলা-পাতি অল্প ব্যবহার করেন। সে-রাতে কাকুকে নিমন্ত্রণ করেন বাবা নিজেই। কাকুর আবার মুখোরোচক খাবার খুবই পছন্দ। অগত্যা সে-ভাবে রান্না করেন মা। রান্নার কাজে মা'র হাত জাদু মাখানো। সামান্য উপাদানে অপূর্ব রান্না।

আহার সেরে কাকু বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছেন। সহসা এক বিপত্তি। মেঘে মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে। গগন ফুঁড়ে অঝোরে বৃষ্টি। পড়ছে তো পড়ছেই। থামার নাম নেই। কী বৃষ্টি। দুর্যোগের মধ্যে কাকুর আর ফেরা হলো না।

হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েন সবাই। খুব পরিশ্রম গেছে সারাদিন। ঘুমিয়ে পড়েন সবাই। ব্যতিক্রম শুধু মা'র বেলায়। নির্জন পরিবেশে ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দ। মাঝে মাঝে দরজা-জানলার পাল্লাগুলো ঝনঝন করে বেজে ওঠে। মা চমকে ওঠেন। ভয় করে। না-ছোড় রাত যেন কাটতে চায় না। রাত শেষ হয়। পুব আকাশে আলো ফোটে। মেঘ কেটে যায়।

সেই সঙ্গে ঝড়ও যায় থেমে। কাকুর ঘুম ভাঙে। মা তাঁকে চা-বিস্কুট দিলেন। তিনি বিদায় নিলেন।

পৃথিবী যেমন ঘোরে তেমনি ঘুরছিল। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। কাকু অকৃপণ হাতে খরচ করছেন আমাদের পিছু। সংসারের সব দায়িত্ব কাকুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বাবার কাছে। আর একটা ব্যাপারে বাবা-মা উভয়ে মানসিক আঘাত পেলেন। গুঞ্জন শুরু হয় কাকুকে নিয়ে। কাকুর অবস্থা সচ্ছল। পাঁচজন তাঁকে মান্যিগণ্যি করে। তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সাথে আমাদের দহরম-মহরম সাধারণের চোখে একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে। তাই মা একদিন বলেই ফেললেন, 'ঠাকুরপো, এ-ভাবে আর কদ্দিন চলবে? একদিন এ-বাংলো তো ছাড়তে হবে। অন্ততঃ মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই তো চাই। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে যে—।'

'ভেবো না, বৌদি। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দরকার একটু ধৈর্য।' কাকু আশ্বস্ত করেন।

কাকু বাংলোয় আসতেন আগের মতো সন্ধ্যের পর। প্রত্যহ চা-চেনাচুরের অংশীদার। তিনি আসর জমিয়ে গল্প করতেন। ফাঁকে ফাঁকে দিদিদের পড়া বলে দিতেন। বাড়ি ফিরতেন একটু রাত করে। মাঝে-মধ্যে থেকেও যেতেন। হঠাৎ এক বিপদ।

সেদিন কাকু এলেন যথারীতি সন্ধ্যের পর। 'শরীর ভাল নেই, বৌদি। ম্যাজ ম্যাজ করছে গা-হাত।'

মা কাকুর কপালে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলেন। তাড়াতাড়ি আদার রস দিয়ে চা বানিয়ে দিলেন। সঙ্গে গোটাকতক আলুর চপ। খেয়ে কাকু চলে গেলেন। মা-ও উঠে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সকলে শুয়ে পড়েছে।

গভীর রাত। চারপাশ সুনসান। নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ দুমদাম শব্দ। দরজার পাল্লা দুটো ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চীৎকার আর গালিগালাজ। মা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভয়ে আঁতকে উঠলেন। বাবা হতবুদ্ধি। দিদিরা আড়ষ্ট। সহসা মা'র মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। আঁচলখানা গাছ-কোমরে বেঁধে বঁটি-হাতে এগিয়ে গেলেন। পিছনে বাবা। ওদিকে তখন দরজায় পড়ছে দমাদ্দম লাথির পর লাথি। গালাগালি সমানে। মা খিল খুলে দিলেন। তিনি বঁটি উঁচিয়ে, উদ্ধত ভঙ্গি। জামাইবাবুকে চিনতে

তাঁর ভুল হলো না। মায়ের রণমূর্তি দেখে সে তার চ্যালা-চামুণ্ডসহ দু'পা পিছিয়ে গেল। হামলাকারিদের মুখে দেশী মদের গন্ধ। মায়ের গা ঘিনঘিন করে ওঠে। জামাইবাবুটির আসল নাম জিতেন হালদার। তবে 'জামাই-বাবু' নামেই সে সমধিক পরিচিত। ডাকসাইটে মস্তান। জামাইবাবুটির গঠন ছিপছিপে পাতলা হলে কি হবে, গায়ে তার অসম্ভব শক্তি। বয়স ত্রিশের ঘরে। ফরসা। ছ'ফুট। গোলাকার মুখ। সে স্থানীয় রাজ-নৈতিক দাদার সোহাগপ্রাপ্ত ডান হাত। থানার বড়বাবুর ইয়ারদোস্ত। তবে খুন-খারাবি-রাহাজানি-ধর্ষণের জন্য যে পুলিশের খাতায় তার নাম নেই তা নয়। তা সত্ত্বেও, সে পুলিশের নাকের ডগায় নানা অপকর্ম করে বেড়ায়। এক সময় কাকুর সাথে তার বনিবনা ছিল ভালরকমই। তার তালডাঙার বাড়িতে কাকুর যাতায়াত ছিল। বাগান-বাড়িতে কাকুর সঙ্গে সে একাধিক বার এসেছিল। মা কিন্তু তাকে মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। তার সাথে মেলামেশা করতে মা কাকুকে বহুবার নিষেধও করেছিলেন। ইদানীং তাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে।

'কোথায় বিপু? শিগ্‌গির বের করে দে।' জামাইয়ের গর্জন শোনা গেল। মায়ের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নির্ঘাত কাকুকে ওরা খুন করবে। আকচা-আকচির ব্যাপার। ভাগ্যিস্ কাকু সেখানে ছিলেন না। মা বললেন, 'জানি না।'

'জানিস না। তবে রে—', জামাই সদলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের ওপর। বাবা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেন। তখন জামাই তাঁর মুখে জোর ঘুষি মারে। তিনি ছিটকে পড়ে যান। বাবা সংজ্ঞা হারালেন। মা তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ যুঝতে পারলেন না। মা'কে ধরে তারা টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে। মা তখন সাহায্যের জন্যে চিৎকার করেন। তাঁকে পাঁজা-কোলা করে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা জিপে জবরদস্তি তোলে তারা। গাড়ি স্টার্ট দেবে, এমন সময় আর-একটা জিপ সহসা এসে সামনে দাঁড়ায়। নিমিষে নেমে এলেন থানার ভারপ্রাপ্ত বড়বাবু তাঁর বাহিনী নিয়ে। বোধ হয় তিনি রোঁদে বেরিয়েছিলেন। কাউকে গ্রেপ্তার করলেন না। উল্টে জামাইকে অনুরোধ জানালেন মা'কে ছেড়ে দেবার জন্য। অবশ্যি তাতেই কাজ হয়। চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে মা কোনমতে রক্ষা পেলেন।

পরদিন সকালে। ততক্ষণে খবর চারদিকে রটে গেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলেন কাকু অসুস্থ শরীরে। তাঁর মুখখানি শুকনো। সঙ্গে

অরবিন্দ ডাক্তার। তিনি বাবাকে পরীক্ষা করেন। বাবার মুখ অস্বাভাবিক ফোলা। শিরা-উপশিরায় নীল রঙ। হাতে পায়ে-পিঠে কালশিটে। ডাক্তার তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

কাকুকে দেখে মা লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন। চোখে তাঁর নামে অশ্রু ধারা। কাকু ছুটলেন থানায়। লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। জামাইদের নামে এফ আই আর নিতে মোটেই রাজি হলেন না থানার বড়বাবু। কাকু তখন অনুরোধ করেন অন্ততঃ একটা ডায়েরি নিতে।

'এবার আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো। ভাল চান তো সরে পড়ুন।' বড়বাবুর গলার স্বর বেশ চড়া।

ফেরার পথে কাকু বাসে উঠলেন। সোজা উপস্থিত হলেন হুগলীর শীতল মিত্রের বাড়ি। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি কাকুর মুখে বৃত্তান্ত সব শুনলেন। কাকুর মানসপটে তখন ভাসে মায়ের বিহ্বল, বেদনাক্লিষ্ট মুখের ছবি।

শীতলবাবু আক্ষেপ করে বললেন, 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যই খরচা করে পুলিশ পোষা। কিন্তু কার্যত তাঁদের ভূমিকা সম্পূর্ণ উল্‌টো। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা খুনের অপরাধীর মতন ভয়ংকর ও বেপরোয়া। প্রশাসনের প্রশ্রয় আর-কি। আমরা বলির পাঁঠার মতো অসহায়।' তিনি একটু থামলেন। 'পথ একটাই আছে—জামাইদের নামে আদালতে মামলা ঠুকে দেওয়া। তাতে কিন্তু ঝুঁকি আছে। পুলিশ ওর পক্ষে। চাপে পড়ে শেষে হয়তো মামলা তুলে নিতে হতে পারে। বরং এক কাজ করা যেতে পারে। আমার একটা বাড়ি তো রয়েছে ভরতপুরে। আপাতত তাঁরা ওখানেই থাকুন-না। নিরাপদ জায়গা। আমার জন্যে একটা ঘর থাকলেই যথেষ্ট। বাকিগুলো তাঁরা ব্যবহার করতে পারে স্বচ্ছন্দে।'

শীতলবাবু হুগলী শহরের অধিবাসী। রতনপুরের পাশে ভরতপুরে তাঁর অনেক জমিজমা—দোফসলি ধানজমি, আলুক্ষেত, গমক্ষেত। তাঁর নিজস্ব তদারকিতেই চাষ-আবাদ হয়। তাই মাঝে-মধ্যে তাঁকে সেখানে থাকতে হয়। থাক সে কথা।

বাবা বাংলো ছেড়ে উঠে গেলেন শীতলবাবুর বাড়ি। সেদিন অবশ্যি তিনি এসেছিলেন। তাঁর সুপুরুষ চেহারা, মুখে সর্বদা হাসি আর ব্যবহারে আন্তরিকতা বাবার ভালো লাগে। তাঁর সঙ্গে আলাপে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাড়ি দেখে তাঁর পছন্দ হয়, আনন্দ হয়। নিরাপদ জায়গা বটে।

প্রায় আড়াই বিঘে জমির ওপর তিন তিনটে বড় মাপের সার সার ঘরওয়ালা একটা সাম্রাজ্য। চারদিক পাঁচিল ঘেরা। প্রায় দেড় মানুষ সই উঁচু। সদর দরজা শাল-সেগুনের। বেশ মজবুত। বাড়িতে স্যানিটারি পায়খানা ও স্নানঘর। তাছাড়া আছে একটা করে নলকূপ ও পাতকুয়ো। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠোন। আম, জাম, নারিকেল, পেয়ারা প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছে ছায়া-ঢাকা।

থিতু হয়ে বসার কিছুদিন পরে। এক রোববার। চারদিকে তখন কমনীয় শরতের রমনীয় পরিবেশ। বিকেলের রোদে সারা আকাশ যেন সোনা মাখানো। মা বেরুলেন। উদ্দেশ্য গ্রামটাকে খুঁটিয়ে দেখা আর অধিবাসীদের সাথে আলাপ-সালাপ করা। সঙ্গে তাঁর, কাজল মাসী। নিকট প্রতিবেশিনী। মায়ের সই। তিনি ঘুরে-ঘুরে সব দেখালেন।

ভরতপুর—নিতান্তই ছোট্ট গ্রাম। অজ পাড়া গাঁ বললেই হয়। রতনপুর থেকে একটা মাঠ পার। রাস্তা-ঘাটের যা অবস্থা। গ্রাম থেকে একটা পায়ে-চলা রাস্তা গিয়ে পড়েছে প্রধান সড়কে। মাইল দেড়েক লম্বা। সুরকি আর টুকরো টুকরো ইট বিছানো। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগকারী পথ বলতে ঐ একটাই। গ্রামের ভেতর আর সব রাস্তা কাঁচা। বর্ষায় জল জমে। কাদা হয়। যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বিস্তর বাঁশ গাছ। কয়েকটা নুয়ে পড়া ঝাড় রাস্তা অবরোধে দাঁড়িয়ে। সেখান দিয়ে চলা-ফেরার সময় মাথা হেঁট করে সেলাম দিতে হয়। নইলে কঞ্চির খোঁচা। সন্ধ্যে হতেই সেখানে ঝিঁঝির একটানা বাজনা। একটা পুকুর ও গোটা কয়েক ডোবা। পুকুরের নাম বড়পুকুর'। বড়' নামেই। বিস্তৃতে এমন কিছু বড় না। চার পাড়ে অজস্র তাল-তেঁতুল গাছ। দুটো মাত্র ঘাট। তাল গাছের ছেঁ দিয়ে ধাপ বানানো। বর্ষায় শেওলা জমে। পিচ্ছিল হয়। পা টিপে-টিপে খুব সাবধানে উঠা-নামা করতে হয়। নইলে পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা। মেয়ে-পুরুষ সবাই একঘাটে চান করে। লজ্জা-টজ্জার কোন বালাই নেই। নেই কোন জাতপাতের বিচার।

মাসী প্রতিবেশীদের সাথে মায়ের পরিচয় করে দেন। তাঁরাও উৎসুক ছিলেন অচেনা আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপ করতে। সরল-সিধে মানুষ তাঁরা। মা ভারি খুশি হলেন। গরীব অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন 'মনের মানুষ'-কে। তাঁদের কাছে তিনি শুনলেন, গ্রামের তিনটে পাড়া— ঘোষ, তাঁতী আর মোল্লা। আমরা ছিলুম গ্রামের শেষপ্রান্তে তাঁতী-পাড়ার

সন্নিকটে। গ্রামে সাকুল্যে তিরিশ-চল্লিশ ঘর ঘোষেরা সংখ্যায় ভারি। সম্পন্ন পরিবার বলতে তাঁরাই। দুধ-ছানার কারবার তাঁদের। তাছাড়া চাষ-বাসও আছে। তাঁতীরা দেনার দায়ে তাঁত বেচে দিয়েছে বেশীরভাগ লোক দিন-মজুরি করে খায়। তাও বছরে চার পাঁচ মাস কাজ। কেউ কেউ রতনপুর হাটতলায় চা-পান-বিড়ির দোকান খুলেছে। তাঁতীদের মধ্যে মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক কবিরাজি করেন। নাম তাঁর নগেন দাস। পাশ-করা না। আঁতুড়ে-বাচ্চারা যখন বুকে দুধ টানতে পারে না, খিঁচুনি হয়, তখন তাঁর ডাক পড়ে। লোকে বলে, পেঁচোয় পেয়েছে। কবিরাজ মশাই ঝাড়ফুঁক করেন। জলপড়া দেন। তার সঙ্গে নানান বক্তাল। বলা বাহুল্য কেউ বাঁচে না। শিশুদের অসুখ-বিসুখে কবিরাজ মশাই একমাত্র ভরসা। পাড়া গাঁয়ে পাশ-করা শিশু-চিকিৎসকই-বা কোথায়? সবে-ধন নীলমণি অরবিন্দ ডাক্তার। পাশ-করা। অভিজ্ঞ। চল্লিশ-পঞ্চাশখানা গ্রামের রোগীদের একলা সামাল দিতে হয়। তাছাড়া গ্রামের কিছু অজ্ঞ লোক শিশুদের এলোপ্যাথি ওষুধ খাওয়াতে রীতিমত ভয় পায়। তাই হাতুড়ে কবিরাজ মশাই হলেন অসহায় দুধের বাচ্চাদের রোগ-নিরাময়ের কাণ্ডারি।

ঘুরতে ঘুরতে মা উপস্থিত হলেন মোল্লা পাড়ায়। সেখানে আলাপ হয় হাসিনা-বিবির সাথে। পক্ক কেশিনী। চেহারায় ভদ্র ছাঁদ। শান্ত লাজুক স্বভাবের। মায়ের হাত ধরে বাড়ির অন্দর-মহলে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। মসজিদ-লাগোয়া তাঁব বাড়িখানি ছবির মতো দেখতে। সদর দরজাহীন বাড়িরা সামনেটায় আব্রু ঢাকতে চটের পর্দা ঝোলানো। চার কামরার পাকা ঘর। আস্‌বেস্‌টস্‌-এর ছাউনি। মা বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর চারপাশে জমে ওঠে নানা জনের ভিড়। হাসিনা-বিবির শিষ্ট সম্ভাষণে তিনি সন্তুষ্ট। সে পাড়ার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলেন। তাদের আর্থিক অবস্থা তত খারাপ না। মেয়ে-পুরুষ উভয়ে রোজগেরে। মহিলারা হাঁস-মুরগি পালন করে। ডিম বেচে সংসার চালায়। অবসর সময় চিকনের কাজ। পুরুষরা গরু-ছাগল-খড়ের ব্যবসা করে। উপার্জন মন্দ হয় না। তবে তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে। দু-চার জন স্কুলের মুখ দেখেছে মাত্র।

তখনো গ্রামে বিদ্যুতের আলো ঢোকেনি। বন জঙ্গল ভরা পল্লী দিন-দুপুরেই ছেয়ে যায় আধো-আঁধারে। রাতের বেলায় সে অন্ধকার গাঢ়তর

হয়ে ওঠে। আটটা কী ন'টা বাজলেই সারা গ্রাম ডুবে যায় নিস্তব্ধ নীরবতায়। বাড়ির বাইরে একলা বেরুতে গা ছমছম করে।

মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে মা নিশ্চিন্ত বোধ করেন তবে পুরোপুরি না। কারণ বাবার বেকারি। তখন ও পর্যন্ত কাকুর আর্থিক আনুকূল্যে সংসার চলছে, যে-টা নাকি মোটেই শোভনীয় নয়। তবে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করতে বাবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। দরখাস্তের পর দরখাস্ত দিয়েছেন বহু অফিসে—সরকারি, বেসরকারি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা তো কম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ। তবু, চাকরির জগতে তল পান না। ভেতরে ভেতরে তিনি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়েন। মেজাজ যায় বিগড়ে।

এক সকালে। মাকে ঠাকুর-পুজোর আয়োজন করতে দেখে বাবার মুখে শ্লেষের হাসি ফোটে। 'পট-ঠাকুরগুলো বোবা-কালা। পুজো করলে যদি চাকরি মিলত, তাহলে দুনিয়ায় কেউ আর বেকার থাকত না।' হঠাৎ এ-হেন মন্তব্য শুনে মা অপ্রতিভ। আহত ও হলেন। ছলছল চোখে তিনি বাবাকে শুধু একবার দেখে নিলেন। তারপর আবার পুজোয় মন দিলেন।

একদিন যথারীতি কাকু এলেন সন্ধের পর। চা-পর্ব শেষে বাবা সখেদে বলেন, 'বেকারত্বের জ্বালা দিনরাত গায়ে বিছুটি বুলোচ্ছে হে। একটুকু-ও ভাল্লাগে না।' কাকু শুধু নিঃশব্দে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকেন। আর জবাবই-বা কী দেবেন?

অর্থ-সংকটের প্রবল চাপে বাবা ভেতরে ভেতরে দিনদিন ক্ষয়ে যেতে থাকেন। শরীর ভেঙে পড়ে। মনে সদাই একরকম অস্বস্তি ও আড়ষ্টতা। নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ করেন। নিঃসঙ্গতা কাটাতে বিড়ি ফুঁকতে শুরু করেন। অথচ যে কোন নেশাকেই তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। পূর্বে কখন ও ধূমপান করেননি। মাঝে-মাঝে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। রোজই একবার করে ছুটে যান রতনপুর ডাকঘরে। চাকরির কোন খবর না পেয়ে নেশাখোরের মতো টলতে টলতে বাড়ি ফেরেন। মাঝ রাতে বিড়ির পর বিড়ি ধরিয়ে তানানানা করে গান ধরেন। ক্রমশঃ তাঁর মুখে নিদ্রাহীনতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। চোখের কোল বসে যায়। তিনি অসংলগ্ন ভাবে প্রায়ই মাকে বলেন, 'তোমার ঠাকুরপোর তো ঘর সংসার আছে। মর্জি-মাফিক টাকা নিলে তাঁর সংসার লাটে উঠবে যে—।'

ক্রমে বাবার অবস্থায় অবনতি হতে থাকে। কেমন যেন বদলে গেলেন তিনি। বসে থাকেন দাঁতে দাঁত চেপে। সব সময় ঝিমুনি-ভাব।

দশটা কথা জিগেস করলে হয়তো একটার জবাব মেলে। তা-ও সংক্ষেপে। কাকুর সঙ্গে বাক্যালাপ একরকম বন্ধ. কাকুকে দেখলেই ভয়ে আঁতকে ওঠেন। অথচ কিছুদিন আগেও তাঁর সাথে গল্প-গুজব করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর এ-রকম পরিবর্তন দেখে মা শংকিত হয়ে পড়েন। কাকু-ও। অরবিন্দ-ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'ডিপ্রেসন'। ওষুধ দিলেন। কোন কাজ হলো না।

শেষ ফাগুনের একদিন। বাবা কোন কাকভোরে বাইরে বেরিয়ে গেছেন সকলের অজ্ঞাতে। বেলা বাড়ছে অথচ ফিরছেন না। মায়ের মনে বিপদের আশংকা। দিদিরা গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত খুঁজলেন। কোন হদিশ মিলল না। মা এবার বিচলিত হয়ে পড়লেন। সেই সময় শীতলবাবু এলেন। মা তাড়াতাড়ি ঘর খুলে দিলেন। তাঁকে আমরা বড়-কাকু বলে ডাকতুম। তিনি নাকি কাকুর চেয়ে বছর খানেকের বড় আর বাবার থেকে এক বছরের ছোট।

বড় কাকু তাঁর শখের আরাম কেদারায় বসলেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মা খানিকক্ষণ হাত-পাখার বাতাস দিলেন। 'একটু বসো, ঠাকুরপো।' মা ব্যস্ত গলায় বলেন।

'না। আজ থাক। খাওয়াটা পাওনা রইল।' একটু থেমে, 'দাদাকে দেখছি না যে—।'

'কোথায় বেরিয়েছে। কিছু বলে যায় নি।'

বড় কাকু চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা লেফাফা বের করলেন। মা-কে অবাক করে তিনি বলেন, 'নিন, নিয়োগপত্র। সন্দেশখালি বি. ডি. ও. অফিসে! উঃ! অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এ্যাদ্দিনে হলো।'

শুনে মায়ের যেন বিশ্বাস হয় না।

'সত্যি।'

বড়কাকু কাঁধ ঝাঁকালেন অল্প। 'এখন উঠি। পরে একদিন আসবো।' তিনি হাতঘড়ি দেখলেন।

'একটু বসো।' মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একগ্লাস শরবত হাতে ফিরে এলেন। বড় কাকু শরবত খেয়ে চলে গেলেন।

মা চিঠিটা নিজের কপালে ঠেকালেন। কুলঙ্গীতে ঠাকুরের কাছে রেখে দিলেন।

ঘণ্টা খানেক বাদে। বাবা নিজে থেকেই ফিরে এলেন। সেই উদভ্রান্ত চেহারা। মা তাঁকে চিঠিটা দিলেন। বাবার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়।

বাবা আবার জীবনকে নোতুন করে খুঁজে পেলেন। তিনি নিয়মিত অফিস যেতেন। মা ভোরে উঠতেন। চান-পুজো-আচ্চা সেরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। বাবা আহারান্তে সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়তেন। সাত-আট কিলোমিটার পথ। বাসে যেতে আধ ঘন্টার বেশী লাগে না। তবু বাবা অফিস খোলার অনেক আগেই সেখানে হাজির হতেন। আর ফিরতেন বড্ড দেরি করে। সন্ধের অনেক পরে। মা তাই একদিন অনুযোগের স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'রোজ রোজ এত দেরি হয় কেন? বাসে এলে এত দেরি হবার কথা তো নয়।'

'সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কি করবো? তাই হেঁটে আসি। পয়সা বাঁচে, বেড়ান হয়, সময়ও কাটে।'

'ভাঙা দেহে এতো পথশ্রম। অসুখ করবে যে—।'

'নাহ, ব্যায়াম হয়। শরীর ভালই থাকবে।'

মা চুপ করে গেলেন।

একদিন কী-একটা দরকারে চারু-পিসি এলেন। বাবা চাকরি পেয়েছেন শুনে তিনি বললেন 'দেখলে তো, ভোলে-বাবার কত দয়া। তারকেশ্বরে বাবার পুজোটা এবার দিয়ে এসো। দেরি করো না।'

দেব-দ্বিজে মায়ের অগাধ ভক্তি। কথাটা তাঁর মনে লেগে গেল। রাতে বাবা অফিস থেকে ফিরলে, মা কথাটা পাড়লেন।

শুনে, বাবার সেই পুরনো ক্ষোভ জেগে ওঠে। 'বাবার যদি এতই ক্ষেমতা, এতই দয়া, তা এই চাকরি আগে হলো না কেন? নাকানি-চোবানি খাওয়ানোর মানে কী? যেতে হয় তুমি যাও। আমি যাব না।'

'অচেনা অজানা জায়গায় একলা যেতে বলছো?'

'এতই যখন ইচ্ছে, ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিতে পারো।' বাবা অনাসক্ত।

মা নীরব। তাঁর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ।

শনিবার। বাবার অফিসে সেদিন ছুটি। সাত-সকালে মা রান্নাবান্না সেরে নিলেন। হাল্কা সাজগোছ করে তিনি বললেন, 'বেরুচ্ছি। মেয়েদের দেখো। ফিরতে ফিরতে রাত হতে পারে।'

তখন বাবা রোয়াকের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যমনস্ক-ভাবে সামনে আমগাছ পানে তিনি এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন মায়ের

কোন কথাই তাঁর কানে ঢোকেনি।

মা চলে গেলেন। সঙ্গে কাকু। বেলা দশটার মধ্যে মা পৌঁছুলেন বাবার থানে। দুধ-পুকুরে চান করে বাবার পুজো দিলেন। ভিজে-কাপড়ে মন্দিরের চারদিকে দণ্ডি খাটলেন। একটা ভাড়া-করা বাসায় রান্না করে দুপুরের আহার সেরে নিলেন। রাতে বাবার রাজবেশ আর আরতি দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না মা। অগত্যা তাঁরা থেকে গেলেন।

বাসার কী ছিরি। মাটির ঘর। টালির ছাউনি। সংকীর্ণ পরিসর। কোনরকমে দু'জনে শুতে পারে। একটা মাত্র জানলা। তাও ছোট মাপের। দরজাও তথৈব। গুঁড়ি মেরে সাবধানে ঢুকতে হয়। নইলে কপাল ফেটে রক্ত। ভেতরটা ঘুপসি। আলো-বাতাসের স্বল্পতা। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোই যা ভরসা। বিছানা বলতে একটা চেটাই। তা-ও ছেঁড়া। ছার-পোকার মিছিল দেখে মা শিউরে উঠলেন। কাকুর মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি। 'বাবার থানে একটু রক্তদান। পুণ্যি হবে।' যা হোক কষ্টে ক্লিষ্টে রাতটুকু কাটিয়ে দিলেন তাঁরা।

পরদিন সকালে। মা বাড়ি ফিরলেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। বাবাকে একটা বাটিতে প্রসাদ দিলেন। তিনি গ্রহণ করলেন না। বললেন, 'নাহ্, এর চেয়ে বিষ ভালো।'

মা কপট ধমক দিলেন। 'ছিঃ ছিঃ। অমন কথা মুখে আনতে আছে?'

তারপর কয়েকটা দিন কাটে নির্বিবাদে।

একদিন। রাত্রি তখন মধ্যযামে। ভীষণ গুমোট। বাবার চোখে ঘুম নেই। মায়ের-ও তাই। বাবা শয্যা ত্যাগ করে রোয়াকে একটা চেয়ারে বসে। মা তাঁকে পাখার বাতাস করছেন। চারদিক জমাট অন্ধকার। মিটমিট করছে তারা। কিছু সাংসারিক কথাবার্তার পর মা জিগ্যেস করেন, 'আচ্ছা, আজকাল ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'কথা বলব কখন? ফিরতে ফিরতে তো রাত হয়ে যায়। তোমার ঠাকুরপো তার আগেই চলে যায়।'

'কেন? ছুটির দিন?

সারাদিন বাড়িতে শুয়ে-বসে-গড়িয়ে কাটাতে কারো ভাল লাগে? সন্ধের পর একটু বেড়াতে ইচ্ছে হয় না?

আমি কিস্যু বুঝিনা ভেবেছো? কৌশলে তাকে এড়িয়ে যাবার মতলব। এমনি করলে, ঠাকুরপো এ-বাড়িতে ঢুকবে না, বলেছে।'

'সেটাই-ভাল।' গম্ভীর স্বরে বলেন বাবা।

'ছিঃ ছিঃ! মুখে আটকালো না। মাইনে যা পাও, মাসের পনেরো দিন-ও চলে না। বাকি দিন চালায় কে? বিনা ভাড়ায় আছো, কার সুপারিশে?' মা রীতিমত ক্ষুব্ধ।

বাবার মুখে আর কথা নেই। চুপ। এমন সময় ঢিপ্ করে একটা আওয়াজ। মা হ্যারিকেন নিয়ে এলেন। 'ওমা, ঢিল।' মা জোড়হাত কপালে ঠেকালেন। 'বাবা রক্ষে করেছেন। একটু হলে তোমার মাথায় লাগত।'

বাবা একটা লাঠি হাতে সারা বাড়ি ঘুরে দেখলেন। তেমন-কিছু নজরে পড়ল না। ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন। 'দুষ্ট লোকের কাজ। থানায় একটা ডায়েরি করতে হবে।'

'হুঁ পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তোমার বাড়ি পাহারা দিতে আসবে?'

'না দেয়, আমাকেই দিতে হবে।'

'থাক, খুব হয়েছে। চলো, শোবে চলো।'

বাকি রাতটুকু কাটে নিরুপদ্রবে। আরো কয়েকটা দিন কাটে সে-ভাবে। এলো নতুন বছর। পয়লা বোশেখ। সকালে। বাবা তক্তা-পোষে বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছেন আর নাকমুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মা এলেন। হাতে তাঁর কাপ-প্লেট। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাবা বললেন, 'বড্ড বেশী চাওয়া হয়ে যাচ্ছে না?'

'ওমা, চাইতে যাবো কেন? এ-তো উপহার। নতুন বছরে কেউ যদি উপহার দেয়, ফিরিয়ে দেব?'

'তা বলে এত্তো সব দামিদামি জিনিস? আমার ধুতি-পাঞ্জাবি আব মেয়েদের পোশাকের দাম কত? তোমাব কটকী শাড়িটার দাম জানো? সোনার বাজার দর কত জানো? আমার আংটি আর তোমার চুড়ি হার ভরি পাঁচেক তো হবেই। এত সব…।'

বাবা আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন। মা বললেন, 'যাঁরা দান করে আনন্দ পেতে চায় তাঁরা কী দাম নিয়ে মাথা ঘামায়? এতে কিন্তুর কী আছে?'

'বেশ। ওকে নেমন্তন্ন করেছো?' বাবা শান্ত কণ্ঠে জিগোস করেন।

'করেছি বৈ-কি। তবে আসতে পারবে কি না সন্দেহ। তার দোকানে হালখাতা।'

'যদি আসে— ? রান্নার যোগাড়-যন্তর ? আমার কিন্তু হাত খালি।'

'জানি। এই নাও।' মা কয়েকটা কড়কড়ে দশ টাকার নোট বাবার হাতে গুঁজে দিলেন।

বাবা বুঝতে পারলেন এ-টাকা ওর ঠাকুরপোই দিয়েছে। তিনি চা খেয়ে থলি হাতে বেরিয়ে গেলেন।

সাধারণতঃ গরিবদের ঘরে নববর্ষের কোন ছায়া পড়ে না। তবে নববর্ষ আমাদের কাছে হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়। পয়লা বোশেখ কাটে আলাদাভাবে। মা চান করে পুজো সেরে নিলেন। বাবা ততক্ষণে বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেন। তাঁর চেহারা বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠল। দিদিরা নতুন পোশাক পরে বেশ হাসি-খুশি। মা-ও নতুন শাড়িখানা পরে নিলেন। তাঁর চেহারা যেন বদলে গেল। মা বাবাকে প্রণাম করলেন। দিদিরা বাবা মা-কে। মা সকলকে মিষ্টিমুখ করালেন।

মধ্যাহ্নপুর। মা কাকুর প্রতীক্ষায়। শেষ মুহূর্তে এলো ভোলা। কাকুর দোকানের কর্মচারী। সে বলে, 'আর অপিক্ষা করবেন না। ছোট-বাবু আসতে পারবে নি। একটা চিঠি দিয়েছেন।' সে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা খাম বের করে। বাবার হাতে দিয়ে সে বিদায় নেয়। বাবা খামের মুখ ছিঁড়লেন। তাতে নাইট-শো'র চারটে সিনেমার পাশ।

রাত আট-টা। বাবা সবাইকে নিয়ে বেরুলেন। সে এলাকায় সিনেমা হল বলতে একটাই—'জয় দুর্গা'। হল-এর মালিক কাকুরই এক আত্মীয়। কলকাতায় থাকেন। মাঝে-মধ্যে আসেন। তবে দেখাশোনার ভার সবটাই কাকুর ওপর।

'এই-যে, নমস্কার। কেমন আছেন ?' জামাই, জিতেন হালদার।

বাবা একটু চমকালেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। প্রতি-নমস্কার জানালেন। 'ভালো।'

'চাকরি পেয়েছেন, শুনলুম।' জামাই বুরুশের মত গোঁফ মুচড়ে নিল। 'একটু আমোদ করব। বেশী চাইছি না। শ'খানেক।'

বাবা এক ঝলকে দেখে নিলেন জামাইয়ের চোখ দু'টো। ছুরির ফলার মত চকচকে। তিনি নিরুত্তর হাসলেন।

'মুলোর মত দাঁত দেখালে কী পেট ভরবে? মালকড়ি কী আছে, ছাড়ুন। শিগগির।'

জামাই খরদৃষ্টিতে মায়ের পানে তাকায়। সেই দৃষ্টির সামনে মায়ের মুখ হয়ে ওঠে বিবর্ণ, নীরক্ত। তাঁর বুক কাঁপে। বাবা যেমন জেদী তেমনি একরোখা। 'মগের মুল্লুক পেয়েছো? খামোখা দান-খয়রাত করতে যাব কেন? সরে পড়ো।'

'কী বললে হে? সরে পড়বো? তাব আগে কলার সুদ্ধ আকাশে উড়তে হবে।' জামাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

মায়ের গলা শুকিয়ে কাঠ। দিদিরা ভয়ার্ত চোখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

বাবা কিন্তু অটল। তিনি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'জানি, তুমি এক বিপজ্জনক নোংরা লোক। সমাজের আবর্জনা। ফের বলছি, ভাল চাও তো সরে পড়ো।'

'বটে। আমাকে শাসানো?' জামাই কর্কশ কণ্ঠে বলে, 'খবরদার। দেখি, কোন শালা রক্ষে করে। পেয়ারের পালোয়ান ভাই? বাঁচাক দেখি—।' সে হিপ পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা ছুরি বের করে।

মা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেলেন। বাবা ততক্ষণ নিষ্পলক চোখে জামাইকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে তিনি গর্জে ওঠেন। 'সাবধান, আর এক পা এগিয়েছো কী মরেছো।' মা তখন ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকেন। তাঁর চোখের তারা স্থির।

সেই বিপন্ন মুহূর্তে ভোলা এসে আচমকা জামাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুরিটা কেড়ে নেয়। আর লড়াই শেষ করেন কাকু নিজেই, তার থুতনিতে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মেরে। ধর-ধর মার-মার রব ওঠে। জামাই ঠাণ্ডা মেরে যায়। ভঙ্গ দেয় রণে।

সিনেমা দেখার আর ইচ্ছে ছিল না কারুরই। সবাই ফিরে এলেন বাড়িতে। কাকু খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন।

বাবা বোধ হয় চেয়েছিলেন আড়ম্বর ও বিলাসিতার বাইরে থেকে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন নির্বিঘ্নে। কিন্তু কাটল না। তালভঙ্গ হয় একের পর এক ঘটনায়।

আষাঢ় তখন বিদায় নিতে চলেছে। আকাশ ঘোলাটে। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। মধ্যরাত্রি হবে। বাবা ঘুমচ্ছেন তক্তাপোষের ওপর। মেঝেয় মাদুর পেতে মা। পাশে দিদিরা। ঘরের এক কোণায় মিটমিটে হ্যারিকেন আলো ছড়াচ্ছে। হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ। বাবার ঘুম ভাঙে। তিনি উঠে বসেন। সজাগ হয়ে থাকে তাঁর কান। বাইরে জানলার কাছে আচমকা আবার একটা শব্দ—খসখস। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন এক ছায়ামূর্তি। দ্রুত সরে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'কে? কে? কে ওখানে?' তৎক্ষণাৎ দরজার খিল খুলে বাইরে এলেন। হাতে হ্যারিকেন আর একটা লাঠি। তাঁর মনে হল কে যেন পাঁচিল টপকে পালাল। তিনি দৌড়ে গেলেন সেদিকে। কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না। বাড়ির বাইরে থেকে কুকুরের মাটি আঁচড়ানো আর ঘেউ ঘেউ আওয়াজ কানে ঢোকে। ব্যাপারখানা তাঁকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে।

পরদিন সকাল। কাকু এলেন। হাতে একটা বড় কাতলা। বাবা দেখেন। মা তো মহা খুশি। চা দিলেন মা। খেতে খেতে বাবা গতরাতের ঘটনা সবিস্তারে বললেন। শুনে, কাকু মন্তব্য করলেন, 'চোর-ছ্যাঁচোড় হবে।'

'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে, ঠাকুরপো।'

'ভয়? ঝোপঝাড়, নদীনালার দেশের মানুষের আবার ভয় কিসে? তুমিই তো বল মানুষের মধ্যে আছেন শিব।'

বাবা উচ্চ হেসে উঠলেন। 'ঠিক বলেছো।'

'মানুষের মধ্যে শয়তান-ও তো আছে। ভয় এদেরকে।'

'হুঁ। শিব-শয়তান তাহলে একই ঘরের। শিবের সাঙাত শয়তান। তাঁরা একই কল্‌কে গাঁজা টানে। কী বলো?' বাবা রসিকতা করেন।

মা ধমকে উঠলেন। 'তুমি থামতো। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা?' তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। বললেন, 'মানুষ সৎ, অসৎ-ও বটে। যখন ঈশ্বরীয় গুণগুলো প্রকট হয় তখন সে হয় সৎ। আমরা তাঁকে দেবতার আসনে বসাই। শ্রদ্ধা করি। আর যখন দুশমণি বাড়ে, শয়তানি বাড়ে, সে হয় অসৎ। ঘৃণা করি, ভয় করি।

মায়ের মুখপানে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন কাকু। 'আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর রাখি না।' তিনি একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন। 'দেখি, কী করতে পারি। উঠছি।'

কয়েকদিন পরের ঘটনা। অফিস থেকে বাবা ফিরলেন শ্লথ পায়ে টলতে টলতে। চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। 'শরীর ভাল নেই। ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

মা বাবার কপাল ছুঁয়ে অাঁতকে উঠলেন। 'এ কী! জ্বর যে!'

'ও কিছু না। বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।'

অরবিন্দ-ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না। তার সঙ্গে কাশির দমক। সেভাবে কাটে সাত-আট দিন। ডাক্তার-বাবু পাল্টে পাল্টে ওষুধ দিতে থাকেন। কিছুমাত্র উপশম হয় না। একদিন কফের সাথে রক্ত দেখা দেয়। বুকের ফটো তোলা হলো। উভয় ফুসফুসে যক্ষ্মা। কফে-ও পাওয়া যায় যক্ষ্মারোগের জীবাণু। প্রস্রাবে চিনি। রক্তে-ও চিনির মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঢের বেশী। কয়েকদিনের মধ্যে নতুন উপসর্গ—অরকাইটিস (Orobitis)। মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। একে তো জোড়াতালি দেওয়া সংসার। এবার বোঝার ওপর শাকের অাঁটি। ডাক্তারবাবু বলেন, 'রোগ সংক্রামক। রোগীকে আলাদা রাখতে হবে। ওষুধপত্রের খরচা অল্প না। সারতে সময় লাগবে।' মা বিহ্বল হয়ে পড়েন। কাকু চিন্তিত।

বাবা হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। একদিন আক্ষেপ করে কাকুকে বললেন, 'অনেক চেষ্টা-চরিত তো করলুম। অভাব থেকে মুক্তি পেলাম কই? যার ঘরদোর নেই, সে ভবঘুরে বেদে ছাড়া আর কী? বহুমূত্র ধরেছে। তার ওপর যক্ষ্মার বাসা। প্রাণশক্তি নিঃস্ব হয়ে আসছে। এবার আমার পালা শেষ পর্বে।'

কাকু তাঁর দরদী হাতখানি বাবার বুকে-পিঠে বুলোতে থাকেন। 'দেহ থাকলে. অসুখ হবে। এটাই নিয়ম। মুষড়ে পড়লে হবে কেন? সেরে যাবেই। কিছুদিন ভোগান্তি এই যা।' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় কী? আমি তো আছি। খরচের জন্যে ভাবতে হবে না।' বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো চিকিৎসা চলতে থাকে। মা বাবার সেবা শুশ্রূষা করেন। চারু-পিসী রোজ একঘটি করে খাঁটি দুধ দিতেন। ডিম দিতেন কাজল-মাসি। দাম নিতেন না। চিকিৎসার খরচ বাবদ কাকু দরাজ হাত উজাড় করে দিলেন।

বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন। যক্ষ্মা থেকে রেহাই পেলেন বটে। কিন্তু বেয়াড়া বহুমূত্র রয়ে গেল আমৃত্যু সঙ্গী হয়ে। বাবা আবার কর্ম-জীবনে ফিরে গেলেন।'

মানু হঠাৎ চুপ করে যায়। মনে হয় সে কথাব খেই হারিয়ে ফেলেছে। ডাঃ দীক্ষিত গম্ভীর স্বরে বলেন, 'বলো। তারপর ?'

'বলছি। তাবপর ? তারপর সংসারের চাকা ঘুরতে থাকে ঠিক আগের মতো। মায়েব বুকের গোপন কোণে এতদিন ধরে একটা ব্যথার কাঁটা আটকে ছিল। সে-টা খচখচ করতে থাকে। ইদানিং বেশী করে। ব্যথার কারণ অন্য কিছু না। একটি পুত্র সন্তানের অভাব। বড়ই ব্যর্থ লাগে তাঁর জীবনটাকে। বাবার কিন্তু সেদিকে মোটেই চিন্তা ছিল না। তাই একদিন নিরুপায় হয়েই মা অনুযোগ কবলেন, 'এ-ভাবে কী সারাটা জীবন কাটবে ? না, ঠাকুরপো চিরকাল দেখবে ? মেয়েদেব বে-থা হবে। আমাদের বয়স হবে। তখন দেখবে কে ?'

কথা অবশ্যই যুক্তিসংগত। ছোট দিদির জন্মের পর আট আট-টা বছব কেটে গেছে। মায়ের আর কোন সন্তান হয় নি। ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হয় না বাবার। কিন্তু তিনি বুঝতে না পারার ভান করেন। রসিকতা করে বলেন, 'কেন ? তোমার ভোলে-বাবা আছেন। দেখবেন।'

'তখন কোন বাবাই দেখবে না।'

একদিন আড়ালে কাকুকে ব্যাপাবটা খুলে বলেন বাবা। কাকু-ও পরামর্শ করেন অরবিন্দ ডাক্তারের সাথে। ডাক্তারবাবু বাবা-মা উভয়কে পরীক্ষা করেন। ডাক্তারবাবুর অভিমত: মায়েব জরায়ুতে অস্ত্রোপচার দরকার।

মা ভর্তি হলেন আরোগ্য ভবনে। কলকাতায় এক খানদানি নার্সিং হোম। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অস্ত্রোপচার করেন প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডাঃ দেবব্রত মুখার্জি। কিছুদিন সেখানে থাকার পর সুস্থ হয়ে মা বাড়ি ফিরলেন।

মাস-খানেক বাদে মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বরজ্বর ভাব। মুখে অরুচি। যা খান, বমি হয়। শরীব খুবই দুর্বল। বাবা উদ্বিগ্ন। কাকু বিচলিত। ঘর-গৃহস্থালির কাজ বাবাকে দেখতে হয়। দিদিরা অবশ্যি তাঁকে সাহায্য করতেন। চাক-পিসি ও কাজল-মাসি অযাচিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। অরবিন্দ-ডাক্তার মাকে পরীক্ষা করে বলেন, 'এখন উনি গর্ভবতী।'

শুনে, বাবা একটু উত্তেজিত। 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ইচ্ছে করে বোঝা বাড়ানো।' কথাটা চারু-পিসির কানে যায়। তিনি বাবাকে ধমকে উঠলেন। বাবা চুপ করে যান। মা ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে থাকেন। পিসি একগ্লাস গ্লুকোজের জল দিলেন মাকে। যা হোক, ডাক্তার-বাবুর সুচিকিৎসায় মা সেরে উঠলেন। সুস্থ হয়ে তিনি সাংসারিক কাজে মন দিলেন। ডাক্তার-বাবু প্রায়ই আসতেন। খোঁজ-খবর নিতেন।

ক্রমে আমার জন্ম-সময় ঘনিয়ে আসে। অরবিন্দ-ডাক্তারের পরামর্শে মাকে ফের ভর্তি করা হয় আরোগ্য-ভবনে। সেখানে শুধু সম্পন্ন-মানুষজনের ভিড়। আমরাই ছিলুম ব্যতিক্রম। আব যে-টা সম্ভব হয়েছিল কাকুর আর্থিক অনুকূল্যে। ডাঃ দেবব্রত মুখার্জি মাকে পরীক্ষা করেন। তিনি বিধান দিলেন – 'সিজারিয়ান অপারেশন'। কাকু মুষড়ে পড়েন। বাবার চোখ কপালে। 'ফের অপারেশন।'

অস্ত্রোপচাব সফল হলো। মায়ের ম্লান মুখ ভরে গেল মাতৃত্বের গর্ব ও হাসিতে।

একটা মোটরে আমরা বাড়ি ফিবি। রাস্তা তো কম না। একটু রাতই হলো। চারদিক সুনসান। নিস্তব্ধ। সেই নৈঃশব্দ ভাঙে শুধু মোটরের হর্ণ। নবজাতককে স্বাগত জানাতে সে-রাত্রে গ্রামবাসীব কেউ উপস্থিত ছিল না। এসেছিল শৃগাল-সাবমেয় দল বেঁধে। হুক্কাহুয়াই যেন হুলুধ্বনি। আর ঘেউ ঘেউ ছিল স্বাগত সম্ভাষণ। আর কী আশ্চর্য। সেই নিশুতি রাতে শঙ্খধ্বনি দেন কাকু স্বয়ং।

ভোর না-হতেই গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর আগমনে আমাদের বাড়ি গমগম করতে থাকে। এলেন কাজল মাসি আর চারু-পিসি। তাঁদের চোখে খুশির ঢেউ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। 'বাঃ বাঃ কী সুন্দর। এক-মাথা চুল। চাঁদপানা মুখ।' আমার ডান পায়ের তলায় একটা বড় জড়ুল দেখে মাসি বলেন, 'খুব পয়মন্ত'। বাস্তবিক আমি ছিলুম খুবই দুষ্টিনন্দন।

মাতৃদুগ্ধে আমার নাকি পেট ভরত না। বাজারের টিনের দুধ—কাকুর অপছন্দ। নাকি বিলকুল ভেজাল। পেটের অসুখ করে। তাই তিনি একটা দুধেল গাই কিনে আনেন। দুধ দোয়ার বরাত ছিল পিসির ওপর। দু'বেলায় দুধ হোত প্রায় কেজি তিন-চার।

মাঝে-মধ্যে আমাকে নিয়ে কাকুর সাথে বাবার কথা কাটাকাটি হোত। ডাক্তারের নির্দেশ মতো বাবা কিনে আনেন একশিশি ভিটামিন

তেল। কাকু নিয়ে এলেন তাঁর ঘরের সরষে-ভাঙা তেল। বাবার মত —আমাকে ভিটামিন তেল মাখানো হোক। কাকুর মত—ওটা ভেজাল। আমাকে খাঁটি সরষের তেলই মাখানো হোক। বাবার সঙ্গে কাকু তর্ক জুড়ে দিলেন। বাবা তখন ঠাট্টা করে বলেন, 'তোমার মজ্জায় মজ্জায় ভেজাল ঢুকেছে। দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, তারপর কোনদিন হয়তো বলবে মানুষে-ও ভেজাল। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়।' উপস্থিত সকলে হেসে উঠলেন। কাকু কিন্তু নিশ্চুপ থাকলেন। তাঁর মুখখানি হয়ে ওঠে পাংশুবর্ণ। বাবার নজর এড়ায় নি। মা পড়লেন ফাঁপরে। শেষে বাবা নিজেই সালিশি মানলেন পিসিকে।

পিসি বললেন, 'সরষে-তেল মাখিয়ে রোদে-গরম দুব্বোর জলে নাওয়ালে বাচ্চাদের পুঁয়ে পায় না।' সেই থেকে পিসি রোজ সকালে আমাকে সরষে-তেল মাখিয়ে রোদে দিতেন। একটা অগভীর পাথর-বাটিতে কয়েকটা দুর্বাঘাস-সমেত জল রোদে রাখা হোত। তিন-চার ঘণ্টা বাদে সেই জলে আমাকে চান করিয়ে দিতেন পিসি।

পরে জেনেছি, নিরক্ষরা প্রাচীনার কথাই সত্যি। 'পুঁয়ে' শব্দের অর্থ হলো রিকেট্। দুর্বাঘাসের ক্লোরোফিল বা সবুজকণা সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি (রবি ঠাকুরের ভাষায় বেগানি-পারের আলো) শুষে নিয়ে তৈরী করে ভিটামিন ডি$_2$—রিকেট্ রোগের প্রতিষেধক। তাছাড়া চামড়াতে-ও অতি-বেগনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন ডি তৈরী হয়।

আমি ছিলুম খুবই কাঁদুনে। আমাকে ভোলতে কাকু নিয়ে এলেন একটা বেতের দোলনা। সন্ধেবেলা যখন বাড়িতে গপ্পের আসর বসত তখন সবাইকে চমকে দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতুম বিচ্ছিরি রকম কান্না জুড়ে। কাকু তখন দু'হাতে দোলনা ঠেলতেন। গালে ঠোনা মেরে কত-না আদর করতেন।

ক্রমে দোলনা ছেড়ে মাটিতে হামা টানতে শুরু করি। বসতে শিখি, হাঁটতে শিখি আর শিখি বাবা-মা-কাকু-দিদিদের আদো আদো ভাষায় ডাকতে। দিন যায়, মাস যায়, ঘুরে আসে বছর। এমনি করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে ছ'য়ের ঘরে পা রাখি। স্কুলে ভর্তি হই।

আমায় ঘিরে কাকুর হয়তো কিছু সাধ ছিল। হয়তো-বা কোন স্বপ্ন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আমাকে দিয়ে হয়তো তিনি সে-অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন। যাই-বা হোক, আমি ছিলুম তাঁর নয়নের মণি।

দুরন্ত বলে আমার দুর্নাম-ও ছিল। চারু-পিসি দুপুরে যখন আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় শুয়ে থাকতেন, আমি চুপিসারে রান্নাঘরে ঢুকে পড়তুম। দুধ-ননীর বাটি দিব্যি সাফ করে দিতুম। ধরা-ও পড়তুম কখনো-সখনো। প্রহার তো দূরের কথা, তিনি ভর্ৎসনা পর্যন্ত করতেন না। উল্‌টে আমাকে কোলে তুলে 'ননী-চোরা' বলে কত-যে আদর করতেন। এত নাই দিতে পিসিকে বহুবার নিষেধ করেছিলেন মা। তিনি কিন্তু সে-কথা মোটেই কানে তুলতেন না।

কাজল-মাসিব ওপর দৌরাত্ম্য কম করিনি। আমের সময় আম, জামের সময় জাম, নিদেন পাকা কলা চাই-ই। আমাকে তিনি কোলে বসিয়ে খাওয়াতেন। আমি ছিলুম তাঁর আদরের দুলাল।

শুধু রূপে নয়, গুণেও কম ছিলুম না। প্রতি বছর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হতুম। অথচ গৃহ-শিক্ষকের প্রয়োজন হোত না।

আমি তখন চতুর্থ কী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। দিদিরা তখন কলেজে পড়ছেন। একলা হেঁটে স্কুলে যেতুম। যেতে আসতে কম-বেশী চার কিমি। কোন কষ্ট হোত না। সেই সময় হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে হঠাৎ আমাকে ঘিরে নানাবিধ গুঞ্জন শুরু হয়। কাকুর সম্বন্ধেও ফিসফাস।

এক অপরাহ্ণ বেলা। আমি স্কুল-ফেরতা বাড়ি আসছি। সহসা টুকরো-টুকরো কথা কানে আসে। 'বিপুর স্ত্রীভাগ্য বলিহারি,...গস্তানি।' অনুমানে বুঝি—আলোচনা কাকুর সম্বন্ধে। 'গস্তানি' শব্দের অর্থ তখন বুঝিনি। তাই তাদের কথা গায়ে মাখিনি। এখন সে-সব কথা মনে পড়লে রাগে গা জ্বালা করে। আমাকে দেখলেই কিছু লোক হাসাহাসি করত। টিটকারি মারত—'রাজপুত্তুর যাচ্ছে। বিপুর নেওটা ছেলে।' মনে মনে যথেষ্ট আঘাত পেতুম। মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদ করতুম না। মায়ের নিষেধ। তিনি বলতেন, 'সহ্য কর। একদিন সবাই চুপ মেরে যাবে।' আর হয়েছিল ঠিক তাই-ই। তবে একটা ঘটনা আমার অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত করে।

শীত-ছোঁয়া পড়ন্ত বেলা। আমি বাড়ি ফিরছি। হাতে বই খাতা। আচমকা আমার পথ আগলায় গোরাদা। তাকে ভালরকম চিনি। রতন-পুরের বাড়ুজ্যে বাড়ির ছেলে। ভীষণ ডেঁপো। উঠতি মস্তান। আমার চেয়ে বছর সাত-আটের বড়। কী একটা মেয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে স্কুলে তার নাম কাটা যায়। একবার বুঝি হাজত-ও খাটে। আমাকে কিন্তু সে বরাবরই স্নেহের চক্ষে দেখত। কিছুদিন আগে সে একটা ফাউনটেন পেন

উপহার দিয়েছিল। সেদিন তার মাথায় কী ভূত চাপে কে জানে? সে চাপাস্বরে বলে, 'এই আমার একটা কাজ করে দিবি?'

'কী?'

গোরাদা বলে, 'দেখ, তোর কাছে ভড়ং করছি না—একদম। পঞ্চার সঙ্গে আমার তক্ক হয়ে গেছে। যদি জিতি, ফেব তোকে একটা পেন দেবো। বিলিতি পেন। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি।'

আমি উৎসাহিত হলুম। 'ঠিক আছে। কী করতে হবে?'

'খুব সোজা। এখন তোর কাকু তো দোকানে। পঞ্চাও সেখানে। তুই আমার সঙ্গে চ। কাকুকে বলবি—বাবা, তোমায় মা ডাকছে। ব্যস, এই একটা কথা।'

রাগে আমার গা রিরি করে ওঠে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলি, 'না'।

গোরাদা গেল চটে। সে সজোরে আমার নড়া চেপে ধরে। বুঝি, হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায়। চিৎকার করে উঠি, 'লাগছে, লাগছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে—।'

দাবড়ি মেরে গোরাদা বলে, 'আই কাকুর পোলা। যা বলছি—। একটু নড়চড় করেছিস তো মরেছিস। নেড়ি কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। বলবি কী না?'

আমি বিব্রত বোধ করি। চকিতে চারপাশ দেখে নিলুম। অদূরে দাঁড়িয়ে জগা। তারই সাগরেদ। আর কেউ নেই। থাকলেই-বা কী? মস্তানির হাটে কোন দাদাই আসবে না নাক গলাতে। আমি চুপ করে থাকি।

'চুপ করে রইলি যে—। এখনো বল— ?' গোরাদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

চাপা উত্তেজনায় আমার সারা শরীর এবার কাঁপতে থাকে। এক হ্যাঁচকায় হাত ছাড়িয়ে নিলুম। বলি, 'বেশী মস্তানি দেখাস নি। পরীক্ষার খাতায় বড়-বড় রসগোল্লা পেতিস। লজ্জা করে না?'

'আই মুখ সামলে। তোর মুরোদ কত জানা আছে। এক ঘুসিতে—।'

'ঐ—রে কাকু—।' জগার জোর চিৎকার।

গোরাদা আর কোন দিকে তাকাবার ফুরসুৎ পেল না। দু'জনেই এক ছুটে হাওয়া। কাকু হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন। আমার কাছে সব শুনলেন। তাঁর দাঁত কড়-মড়িয়ে উঠে। 'কার বুকে এত পাটা, এগিয়ে আসুক, দেখি।'

॥ পাঁচ ॥

বলতে বলতে মানু হঠাৎ থেমে যায়। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ে। তখন দীক্ষিত বলেন, 'তারপর ?'

মানু বলতে থাকে : 'এই ঘটনা-বহুল সংসার তখন দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল। মোটামুটি শিক্ষিত স্বচ্ছল পরিবারে। স্কুলের পাট চুকিয়ে আমি-ও চলে আসি কলকাতায়। বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হই। মেসে থেকে পড়াশোনা করতে থাকি। শুধু গরমে ও পুজোর ছুটিতে বাড়ি যেতুম। তবে মেসে থাকাকালীন ফি-হপ্তায় কাকুকে চিঠি দিতে হোত। জবাব-ও পেতুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

বারো ক্লাস পাশ করে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকলুম বিজ্ঞান-বিভাগে। পদার্থ, রসায়ন ও অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করি। আমার অশৈশবের স্বপ্ন—বৈজ্ঞানিক হব। বাবা-মায়ের মতও তাই। পদার্থ-বিজ্ঞান ছিল আমার প্রিয় বিষয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন আমার প্রিয় বিজ্ঞানী। তাঁর একটা বাঁধানো ছবি ছিল আমার পডার টেবিলের ওপর। আমি তাঁকে দেবতার মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করতুম। কিন্তু বাদ সাধলেন কাকু স্বয়ং। তিনি বললেন, 'বিজ্ঞানী হবে, ভাল কথা। কিন্তু ভারতের মতো গরিব দেশে বিজ্ঞান-চর্চার সে পরিবেশ কোথায় ? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এখন 'আয়ারাম-গয়ারাম'দের প্রভুত্ব। সর্বত্র গয়ং গচ্ছ ভাব। সরকারি প্রভুদের দাপটে 'অভিমন্যু-বধে'র দশা। শেষে তোমায় না খেয়ে মরতে হবে। এম্. এস্‌সি. পাশ-করা কত মেধাবী ছেলেকে দেখছি বাসে কনডাক্টরি করতে—হেল্পারের কাজ করতে। কী দরকার ঝুঁকি নেবার ? আমার মতে ডাক্তার হওয়াই শ্রেয়। তা'হলে সেবা ও রোজগার দুই-ই হবে।' যা হোক তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে আমি ডাক্তারিতে ভর্তি-পরীক্ষায় বসলুম। সুযোগও মিলে গেল। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ঢুকলুম।

আমি তখন ডাক্তারি পড়ছি। কাকুর পরিবারে দেখা দেয় সংকট। জেঠুমণি, মানে কাকুর বড়দা, বিস্তর টাকার কোন হিসেব পেলেন না। তাঁর ব্যবসা দারুণ চোট খেল। সেই নিয়ে কাকুর সঙ্গে তাঁর বচসা। তবে কাকুকে সে রকম আপত্তিকর কোন কথা বলেন নি তিনি। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিস কোনদিন? আমার কথা না হয় ছেড়ে দিলুম। তোর স্ত্রীর কথা? দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়। এবার তো কারবার লাটে উঠবে।'—কাকু কোন কথা বলেন নি। তবে ঘটনাটা দুবল করে দেয় জেঠুমণিকে। মনের ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা খান তিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই হোল হার্ট অ্যাটাক। তড়িঘড়ি ইমামবড়া সদর-হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি।

বিরাট পরিবারের দায়-দায়িত্ব কম না। পুরোটাই এসে পড়ে কাকুর কাঁধে। তার ওপর আমাদের সমস্যা। সকলের কথাই ভাবতে হয় তাঁকে। তাঁর কাজ কারবার আবাব পডতিব দিকে। হয়তো লোকসানের কড়ি গুনতে হয়। সে-রকম পরিস্থিতিতে আমি পড়লুম ফাঁপরে। পড়াশোনা না ডকে ওঠে। ক্রমে দুশ্চিন্তার পাহাড় জমে ওঠে মনের কোণে।

একদিন কাকুর চিঠি এলো। তিনি লিখেছিলেন, 'হাল ছেড়ো না। পড়াশোনা চালিয়ে যাও। আমি আছি। ··দারিদ্রের সঙ্গে অনলস আপোসহীন সংগ্রামই. আসল সংগ্রাম। দারিদ্রের মধ্যেই সত্য ও সুন্দরের দর্শন মেলে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। তবেই একদিন-না-একদিন পৌঁছতে পারবে সাফল্যেব দোরগোডায়। মা—ভৈঃ।'

আমি উৎসাহিত হলুম। নিবিষ্ট মনে লেখাপড়ায় মেতে উঠলুম। বাস, বিড়ালেব ভাগ্যে শিকে গেল ছিঁড়ে। কিছু কিছু সাফল্য এসে গেল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে গেলুম। কিছু কিছু সাশ্রয় হলো। মনে বল পেলুম—সাহস হোল।

শিক্ষক-অধ্যাপকদের সুনজরে পড়তে দেরি হলো না। মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক-ছাত্রমহলে আমি তখন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আর সে-সময় আমাকে নিয়ে দারুণ এক ভালো-লাগার বীজ অংকুরিত হয় সুপ্রিয়ার মনে। আমারই সহপাঠিনী। আমার প্রতিভা আর রূপ লাবণ্য বোধ হয় তাকে আকর্ষণ করে। বলতে গেলে তার সাথে আমার আলাপ ছিল যৎসামান্য। কারণ বরাবরই আমি ছিলুম লাজুক স্বভাবের। মেয়েদের সাথে যেচে আলাপ করা, গল্প করা, আদিখ্যেতা মোটেই আমার ধাতে সইত না।

আমি ছিলুম একেবারে নিস্পৃহ। তবু কেন-যে পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্র ধরে আমরা পা বাড়ালুম অন্তরঙ্গতার বৃহত্তর গণ্ডিতে। সামান্য আলাপ শেষে পরিণত হল অনন্য প্রণয়ে।

সুপ্রিয়ার তন্বী শরীরে এমনি এক সৌন্দর্য ছিল যা নাকি আমার চিত্তে বিপুল আলোড়ন তোলে। সোনালী ফ্রেমে বন্দী আয়ত চোখজোড়া যেন মায়া-মেদুর। তার ঢাল কালো চুল, কবির ভাষায় যেন অন্ধকার বিদিশার নিশা। আর আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তার স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা ও তারুণ্যের লাবণ্য। অভিজাত বংশের ধনী-পরিবারের দুলালী সে। একমাত্র সন্তান। ডাঃ এস্ এন্ চৌধুরী তাব বাবা। নামী-দামী ডাক্তারদের মধ্যে একজন। প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। সুপ্রিয়া স্বয়ং নিজস্ব ফিয়াট চালিয়ে আসত কলেজে। তাকে দেখলেই আমার বন্ধুদের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠত। কাউকে সে বিশেষ পাত্তা দিত না। কেন কে জানে, আমার ওপরই তার অনুগ্রহের দৃষ্টি।

সে এক দুরন্ত দিনের পড়ন্ত বেলা। কী কারণে সারা কলকাতায় ট্রাম-বাস-মোটরেব চাকা অচল। হঠাৎ-ই। আমি পড়ি সংকটে। কলেজ স্ট্রীট থেকে কালিঘাট। রাস্তা কম না। এতখানি পথ হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। কী করি? ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে সুপ্রিয়ার মোটর দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়। সে তো যাবে নিউ আলিপুর। যাবার পথে আমাকে মেস-বাড়িতে নামিয়ে দিতে তাব অসুবিধে হবার কথা নয়। ইতস্তত করে, এগিয়ে গেলুম তার গাড়ির কাছ বরাবর। সুপ্রিয়ার হাত তখন স্টিয়ারিং-এ, সবে স্টার্ট নিতে যাচ্ছে। সামনের আয়নায় বোধ হয় সে আমাকে দেখতে পায়। তৎক্ষণাৎ মুখ বাড়িয়ে সে বলে, 'উঠে এসো।' আমি উঠে পড়ি। পাশে বসি। সে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দেয়।

প্রথম প্রথম আমার খুব অস্বস্তি। মোটর-চাপা আমার কাছে স্বপ্ন। বিশেষত এক সুন্দরীর পাশে বসে।

'কোথা যাবে?' সুপ্রিয়া,আলাপের পর থেকেই আপনি-বলার দূরত্ব ঘুচিয়ে নিয়েছে।

'কালিঘাট। বাঁচালে।' আমিও দূরত্ব ঘোচাতে চেষ্টা করেছি।

'বাঁচালুম বুঝি!' হেসে ওঠে সুপ্রিয়া।

হেঁয়ালির অর্থ বোধগম্য হয় না। চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। দেহটাকে গদির ওপর এলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকি।

মোটরের গতিতে তখন ঝড় তুলেছে সুপ্রিয়া। সুদক্ষ চালিকা। রাস্তায় দাঁড়ানো এ-গাড়ি সে-গাড়ির ফাঁক দিয়ে মানুষজনের পাশ কাটিয়ে মোটর চলেছে। তার দক্ষতা দেখে আমি তো অবাক। হঠাৎ জোর ঝাঁকুনি। আমি ডান পাশে হেলে পড়ি। সুপ্রিয়ার কমনীয় তনু-দেহ ক্ষণেকের তরে স্পৃষ্ট হয়। আমার স্নায়ুতন্ত্রে বয়ে যায় তড়িৎ-তরঙ্গ। সুপ্রিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। মেয়েরা সর্বদাই সতর্ক।

আমরা ধর্মতলায় এসে গেলুম। মেট্রো সিনেমার বিপরীত দিকে গাড়ি পার্ক করে সুপ্রিয়া। এক নামী রেস্তোরাঁয় ঢুকি। ভেতরে পায়রার খোপের মতন সারি সারি কামরা। পর্দা ঠেলে একটার ভেতরে গিয়ে বসি। মেনু দেখে সুপ্রিয়া খাবারের অর্ডার দেয়। 'আর কিছু?'

আমি ঘাড় নেড়ে 'না' জানাই।

ওয়েটার খুব শিষ্ট ভঙ্গিতে খাবার পরিবেশন করে। গন্ধে ক্ষিদে আরো বেড়ে যায়।

আমি সুপ্রিয়াকে দেখছিলুম। মনে হোল এ-কাজে সে বেশ রপ্ত। অনভ্যস্ত হাতে আমিও ছুরি চালালুম। কাটলেটের একটা ছোট্ট টুকরো বুলেটের মতন ছিটকে পড়ে সুপ্রিয়ার প্লেটে। আমি অপ্রস্তুত।

সুপ্রিয়া কিন্তু ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়। সে বলে, 'সাবাস। তোমার কাটলেটের তেজ বলিহারি।'

সুপ্রিয়া টি-পট থেকে কাপে চায়ের লিকার ঢালে। তাতে দুধ ও চিনি মেশায়। কাপ আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমরা চা খাচ্ছি অল্প অল্প করে। কখন যে কাপের তলানিটুকু-ও শেষ করে ফেলেছি, হুঁশ নেই। আমি সুপ্রিয়ার মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। তার চোখের তারায় তারায় কত কথা ছড়ানো। গল্পই শুনছি। খেয়াল হোল একটুকরো শব্দে—ঠক্। দেখি, ওয়েটার বিল-সমেত প্লেট টেবিলের ওপর রেখে সেলাম দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়া বিল চুকিয়ে দেয়। বাইরে বেরিয়ে এলুম।

হাঁটতে হাঁটতে আবার মেট্রোর ফুটপাতে। তখন সবে ম্যাটিনি শো ভেঙেছে। হাজারো মানুষের জমাট ভিড়। হাস্য-চিৎকার—উল্লাসের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সারা ফুটপাত জুড়ে হরেকরকম ব্যাপারির রকমারি বেসাতি। চোখ-ধাঁধান পণ্যসম্ভার থরে থরে সাজান। খদ্দেরের সঙ্গে চলেছে দরকষাকষি। ফুটপাতের এক প্রান্তে কয়েক জনা রূপসী রমণী

দাঁড়িয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে। যেন কারো জন্যে প্রতীক্ষা রত। তাদের বঙ্কিম চোখে চঞ্চল চাহনি। সে চাহনির পঞ্চম শরে আহত রূপ-পিপাসু রসিক নাগরের ভিড় দেখার মতো। দরদস্তুর চলেছে সেখানে-ও। তখন সবে চৌরঙ্গির বুকে জেগেছে প্রাণ-চাঞ্চল্য। আমরা রাস্তা পার হয়ে চলে গেলুম মোটরের কাছে। সেখানেও এক বিস্ময়। দু-তিনজন সায়েবি পোশাক-পরা ভদ্রলোক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত। তাদের দেহ নিঃসৃত উষ্ণ প্রস্রবণে ভেসে যাচ্ছে দেউলে পথের রাস্তা। অদূরে দু'জন কনস্টেবল খৈনী ডলছে। আমরা নিঃশব্দে মোটরে উঠে বসি। সুপ্রিয়া স্টিয়ারিং-এ হাত লাগায়। আর তখনি কঙ্কালসার ছেলে-কোলে এক জীর্ণ দেহী মহিলা তার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। সুপ্রিয়া তার বটুয়া থেকে কিছু খুচরো পয়সা বের করে তাকে দেয়। সে কপালে হাত ঠেকায়। তারপর চারপায়ে গতি তুলে গাড়ি ছুটতে থাকে। যেতে যেতে সুপ্রিয়া বলে, 'সেফ্ সেক্স বইটা শুনেছি দারুণ হিট করেছে। একদিন দেখলে হয়।'

'বেশ তো'। আমি বলি।

মেস-বাড়ির সামনে মোটর থামে। আমি নেমে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া-ও। 'চলো তোমার বাসা দেখে আসি।'

'এসো'। কাকের বাসা।' আমি বলি।

'তা হোক।'

আমার পিছু পিছু সুপ্রিয়া তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে। তালা খুলি। সুইচ টিপে দিই। মুহূর্তে ঘরের ভূতুড়ে অবস্থা প্রকাশ পায়। সুপ্রিয়া ঘুরণ-চোখে এক লহমায় সব দেখে নিল। দেয়ালে পলেস্তারা খসা। একপাশে একটা নড়বড়ে টেবিল। ওপরে বইখাতা ছড়ান। চেয়ারটা তথৈবচ। এক কোণে বাসি খবরের কাগজ গাদা করা। জামা-প্যান্ট-লুঙ্গি-গামছা বোঝাই দড়ি ঝুলে আছে। জানলার ধারে একটা মাটির কুঁজো। জল চুঁইয়ে পড়ে পড়ে মেঝে দাগ-ধরা। আর কিছু আগড়ুম-বাগড়ুম জিনিসে ঘরখানা বোঝাই। আমার সারা দেহে তখন অস্বস্তি। সুপ্রিয়ার সরস মন্তব্য: 'বাঃ বাঃ খাঁটি বাঙালির খাসা গৃহস্থালি।' তার টলটলে মুখে সদ্যফোটা গোলাপের পাপড়ি-মেলা হাসি। উপহাস না প্রশংসা? বোঝা গেল না। চুপ করে থাকি।

মণিবন্ধনের ঘড়ি দেখে নেয় সুপ্রিয়া। সময় আছে। প্রথমেই সে বিছানায় হাত লাগায়। তারপর ঘরের অন্যান্য জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরের চেহারাটা বদলে যায় অনেকটা। হাত ধুয়ে বিছানায় বসে সে। আমি পাখা চালু করে দিই। মনে হোল সে ক্লান্ত। চা-বিস্কুট হাতে ঘরে ঢোকে রাখহরি। মেসের পরিচারক। খুব চটপটে ছোকরা। বুঝেছিল ঠিক। বলতে হয়নি।

চা খেতে খেতে সুপ্রিয়া আমার বাড়ির খবর নেয়। সব শুনে সুপ্রিয়ার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলুম না। এমন সময় রবীনবাবু আমার ঘরে উঁকি দিলেন। আমার বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। যার-তার-নামে বদনাম রটানো তার স্বভাব। কি-একটা বিদেশী ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। প্রায়ই বান্ধবী নিয়ে আসেন। নিজের বোন বলে পরিচয় দেন। খানাপিনার ব্যবস্থা হয় দস্তুর মত। গল্প করেন অধিক রাত পর্যন্ত।

সবে চা-পর্ব শেষ কবেছি, অনন্তবাবু আনমনে ঘরে ঢোকেন। সরকারি কর্মচারি। ইদানিং সাহিত্যে অনুরাগ জেগেছে। ছোট গল্প আর কবিতা লেখেন। কবিতা সুরে বেঁধে মাঝে-মাঝে আমাকে শোনাতে আসেন। পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। ভুল ত্রুটি শুধবে দিতে হয়। তাতে আমার সময় যায় অনেকখানি।

ঘরে ঢুকেই অনন্তবাবু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। সামলে নিলেন পরমুহূর্তে। ভয় হল গপ্পের ঝাঁপি খুলবেন বুঝি। বললুম, 'সহপাঠিনী'।

'ও'। অনন্তবাবু আর-এক প্রস্থ সুপ্রিয়াকে জরিপ করে নিলেন। 'একটা ভাল গপ্প এসেছে মাথায়। ভাবলুম বলি। মগজটা সাফ হবে।' তিনি অল্পক্ষণের জন্য থামলেন। 'তা অন্য একদিন বলব' খন। হাঁ, আমার পাণ্ডুলিপি?'

আমি তখুনি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলুম। 'তেমন কিছু ভুল তো চোখে পড়ল না। চমৎকার হয়েছে কিন্তু।'

তিনি হাসিমুখে বিদায় নেবাব সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া বলে, 'উঠি তবে।'

সুপ্রিয়াকে এগিয়ে দিতে আমি ও উঠলুম। সিঁড়ির মুখে আবার রবীনবাবুর সঙ্গে দেখা। বিড়বিড় করে কি যেন ইঙ্গিত করলেন। সুপ্রিয়া গম্ভীর হয়ে গেল। আমার বিশ্রী লাগে।

এইরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে আমি ফাইনেল এম. বি. বি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। জুটল নতুন উপসর্গ,—সুপ্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা। সুপ্রিয়ার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে মনের মধ্যে থই থই ভাব। পড়তে বসলেই মানসপটে আনাগোনা করে সুপ্রিয়ার প্রতিচ্ছায়া।

এক রোববার। দুপুরে। চান-খাওয়া সেরে খানিক বিশ্রাম নেব বলে বিছানায় সবে পিঠ দিয়েছি। হঠাৎ কড়া-নাড়ার শব্দ। বিরক্ত হলুম। দরজা খুলি। দেখি, সুপ্রিয়া। আমি আশ্চর্য হলুম। বলি, 'এসো।'

'না, বসবো না। চটপট তৈরী হয়ে নাও।'

'আগে সুস্থির হয়ে বস তো।'

সুপ্রিয়া বসল।

শরবত দিয়েছিলুম এক গ্লাস।

শরবত খেয়ে গ্লাস টেবিলে রাখে সুপ্রিয়া। 'দাঁড়িয়ে রইল যে। তৈরী হও।'

'কোথাও যাবে না কী?'

'মে-ট্রো, মেট্রো। সেফ্ সেক্স। মনে নেই? বা ব্বাঃ, দুটো টিকিটের জন্যে কী হয়রানি। তাও ব্লাকে।'

আমরা ব্যালকনিতে বসে আছি। পাশাপাশি। নানান বাড়তি ছবি দেখানর পর শুরু হয় আসল বই।

দৃশ্য—১। শহর জেনেভা। সুরম্য বিরাট অট্টালিকা। সুসজ্জিত নিভৃত কক্ষে দুই বৃহৎ শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের দুই কর্ণধার করমর্দন করলেন। বহু প্রতীক্ষিত পরমাণু-অস্ত্র-নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিপত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাক্ষর সম্পাদন করলেন সেই দুই শীর্ষনেতা। সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত হোল সমস্ত পরমাণু অস্ত্র আর নক্ষত্র-যুদ্ধের পরিকল্পনা। সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের যে বিভীষণ রক্তচক্ষু সমগ্র দুনিয়াকে অগ্নিগর্ভ আর বিশ্ববাসীকে আর্ত আতংকিত করে রেখেছিল সেই পাশব রক্তচক্ষু নিমিষে নিমীলিত হোল। চিরতরে অবসিত হোল এক দুঃসহ পরিস্থিতি। বহির্দেশে তখন উৎসবের আমেজ। বিশাল জন-সমুদ্র সমবেত উল্লাসে উচ্ছ্বসিত। দেখে, মন ভরে গেল আনন্দে। সুপ্রিয়াকে দেখে মনে হোল খুশি সে-ও।

দৃশ্য—২। একটা বিরাট যাত্রীবাহী বিমান এসে মস্কোর বিমান-বন্দরের টারম্যাক স্পর্শ করল। পিলপিল করে বাইরে বেরিয়ে এলো একদল মার্কিন পর্যটক শান্তি ও মৈত্রের পতাকা হাতে। দলে নারী আছে, পুরুষ আছে। সুস্বাস্থ্য ও সুদর্শন নারীপুরুষ। তাদের জানানো হোল উষ্ণ অভ্যর্থনা। তারা ছড়িয়ে পড়ে শহরে-গ্রামে-গঞ্জে। সমাদর পেল প্রচুর। খানাপিনার ঢালাও ব্যবস্থা। দেশবাসীর সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেল।

দৃশ্য—৩। বড়ই মর্মান্তিক। পর্যটকরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। বিমান-খানা ডানা মেলে ছুটেছে আটলান্টিকের আকাশে। অকস্মাৎ বিস্ফোরণের বিকট শব্দ। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বিমানের গোটা দেহ। ভেঙে পড়ে মহাসাগরের বুকে। সবই তলিয়ে যায় সাগর-গর্ভে। অন্তর্ঘাত? সংশয়ে দুলতে থাকে আমার মন।

দৃশ্য—৪। দু'দেশেই শোকের ছায়া।

দৃশ্য—৫। মস্কোয় একটা খানদানি হাসপাতালের বহির্বিভাগ। শ'য়ে শ'য়ে রোগীর জমাট ভিড়। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই। কেউ ভুগছে অবিরাম জ্বরে। কেউ কাশিতে। কেউ-বা মানসিক বৈকল্যে। সারবন্দী বসে আছে। অস্থিচর্মসার যুবক-যুবতী। কারো কারো চামড়ায় একরকম বিশ্রী দাগ। মোটামুটি একই ধরণের চেহারা রাশিয়ার অন্যান্য হাসপাতালে। প্রত্যেকের শিয়রে যেন মৃত্যুর পরোয়ানা।—অস্বস্তিতে আমার প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। সুপ্রিয়ার নড়াচড়া দেখে মনে হোল, তার-ও।

দৃশ্য—৬। অসংখ্য রোগী বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে। রোগের কারণ অনুসন্ধানে বিশারদ-গবেষক ব্যর্থ ও দুশ্চিন্তিত। ঘরে ঘরে সেই সংবাদ পৌঁছে যায় আধুনিক প্রচার-মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ব্যাপকভাবে ঘটছে। আতংকে সারা দেশ যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

দৃশ্য—৭। অনুসন্ধিৎসু গবেষক-চিকিৎসকরা দিনতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। অবশেষে রোগীদের দেহে পাওয়া গেল 'এইডস্' (বা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম)—এর ভাইরাস জাতীয় জীবাণু—এইচ. আই. ভি. (HIV বা Human Immuno-deficiency Virus)। সেই ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির খবর ফলাও করে ছাপা হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সারা দেশে তখন লেলিহান অগ্নিশিখার মতন 'এইডস্' ছড়িয়ে পড়েছে।

দৃশ্য—৮। আলোড়ন দেখা দেয় দেশ জুড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝড় ওঠে। জীবাণু-যুদ্ধের চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত হলেন মার্কিন দেশ-নায়ক।

দৃশ্য—৯। রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র: একদল বিজ্ঞানী প্রতিষেধক টীকা ও আরোগ্যকারী ওষুধ আবিষ্কারের জন্য ঘাম ঝরাচ্ছেন। সমকামিতা-বিরোধী বিজ্ঞাপনে ছয়লাভ রাস্তাঘাট। সংবাদপত্র রেডিও-দূরদর্শনে বারবার প্রচার করা হচ্ছে—ড্রাগ অ্যাডিকশন ও বিদেশী ইমিগ্রান্ট থেকে সাবধান, ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে জীবনসাথী নির্বাচন করুন,

অপরিচ্ছন্ন ছুঁচে ইনজেক্‌শান নেবেন না—দেহে 'এইডস্‌'-ভাইরাস ঢুকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দৃশ্য—১০। আদালতের এক প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ। জনৈকা মহিলা অভিযুক্তা হয়েছেন হাত-ব্যাগে কনডোম না রাখার অভিযোগে।

দৃশ্য—১১। রাত্রি-নাচের আসর। গমগম করছে তরুণ-তরুণীর মদির উল্লাসে। নর-নারী উভয়ে গভীর চুম্বনে ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেকের দেহ অ্যাপ্রণে ঢাকা। হাতে গ্লাভস্‌। ঠোঁঠে-নাকে আবরণ। মাথায় হেডক্যাপ।

দেখে, আমার মাথা বোঁ করে ঘুরে যায়। এইডস্‌-ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ি। আর তখনই সুপ্রিয়া তার পা দিয়ে আমার বাঁ পায়ের পাতায় চাপ দেয়। নিমিষে এইডস্‌-শঙ্কা যায় উপে। আমার দেহে ছড়িয়ে পড়ে এক-প্রকার অন্য এক উত্তেজনার আগুন।

মেট্রোর উল্‌টো দিকে রাস্তার ধারে ছিল সুপ্রিয়ার মোটর পার্ক করা। সুপ্রিয়া গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সোজা গিয়ে ডাইনে মোড় নেয় সে। তারপর বাঁয়ে, ফের সোজা। সে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে আর আমি তাকিয়ে আছি। সহসা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমার চমক ভাঙে। দেখি, সুপ্রিয়া মোটর পার্ক করছে। 'চলো—। খানিক জিরিয়ে নেওয়া যাক।' সুপ্রিয়ার মুখে হাসি।

ঘন সবুজের নিভৃত বিস্তার। ময়দানে তখন দিনান্তের তিরতির রোদ। সুপ্রিয়া সাইড-ব্যাগ থেকে বের করে একটা মোটা প্যাকেট। চটপট খুলেও ফেলে সে। দেখি, নরম পাকের সন্দেশ। দুজনে ভাগাভাগি করে খেতে থাকি। আমার মনে ফের এইডস্‌-চিন্তা। অন্যমনা হয়ে পড়ি।

'নাহ্‌, ভয় নেই। খাবারে এইডস্‌ ভাইরাস থাকে না।' টিপ্পুনি কাটে সুপ্রিয়া।

'থাকলে, ক্ষতি কী? পেটের এ্যাসিডে পুড়ে মরবে।' আমি সন্দেশ মুখে ফেলে ওর দিকে তাকাই।

'বইটা যুগোপযোগী হয়েছে, কী বলো?' সুপ্রিয়া কপালের চুল সরায়। বাতাস দিচ্ছিল।

'খুবই।' আমি সংক্ষেপে জবাব দিলুম।

এমন সময় বোমা ফাটানোর শব্দ। ভ্রমণার্থীর দল কাছে দূরে যারা ছিল, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। আমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। দেখি, একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলি। কিছু বোঝার আগেই জনা-তিনেক ছোকরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায়—হঠাৎ-ই। আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। চোঙা প্যান্ট।

ডোরাকাটা হাফহাতা গেঞ্জি। মাথায় হিপি-চুলের ঠাস বুনন। মুখে ভুর-ভুরে চুল্লুর গন্ধ। ময়দানের মস্তান।

তাদের মধ্যে ভারি চেহারার একজন শিস দেয়। বেশ জোরেই। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি আর খরিশ্ চাহনি দেখে আমার সারা শরীর শিরশির করে ওঠে।

একজনার লম্বাটে গড়ন। সে সন্দেশের খালি প্যাকেট-টা কুড়িয়ে নেয়। সুপ্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলে, 'আচ্ছা স্বার্থপর! আমাদের জন্যে কিছু রাখবেন তো!' তারপর সে ফুটবলে হাই তোলার মতন প্যাকেটে দেয় এক শুট। শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে দূরে গিয়ে পড়ে প্যাকেটটা। কর্কশ স্বরে বলে, 'ঘড়ি আর কানের দুল দুটো খুলে দিন। চটপট।' তার কাঁচা ভুরুর তলায় চোখ দুটো জলছিল।

তৃতীয় জনের কাপ্তেন কাপ্তেন চেহারা। মনে হোল সে দলের গুরু। হাতে তার জলন্ত সিগারেট ঝোলানো। পাকানো চোখ থেকে সে আমার পানে খর দৃষ্টিবান্ হানে। 'কী দাদা, কার্তিকের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড। হৃদয় নিবেদন করতে এসেছেন। মালকড়ি কী আছে?—ছাড়ুন।' সে আমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়।

সুপ্রিয়া তখন নির্ভীক দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি ফেলছে।

'কী দেখছেন? কেউ আসবে না। শিগ্‌গির—।' লম্বাটে গড়নের উদ্ধত গলা।

'চম্বল পেয়েছো? পুলিশ ডাকবো।' সুপ্রিয়া চিৎকার করে ওঠে।

হাঃ হাঃ হাঃ......। নেকড়ের মতো দাঁত বের করে তারা একসঙ্গে হেসে ওঠে। উদ্দাম হাসিব সে কি তীব্র শব্দ! আমার নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যায়।

'ডাকুন ডাকুন। ডেকে দেবো? ফেঁসে যাবেন দিদিমণি। ফেঁসে যাবেন।' গুরু তাচ্ছিল্য-ভরা গলায় বলে।

'বাব্বা! এত দেরি! খুলে দেন, খুলে দেন। নইলে আমরাই...।' লম্বাটে গড়ন সুপ্রিয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুম্বনের ভঙ্গিমায়।

রাগে তখন আমার সারা গা জলে ওঠে। নিমেষে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিদ্যুতের মতো ছুটতে থাকে অসম্ভব শক্তি। চিতাবাঘের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠি। উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করি, 'খবরদার।' মুঠি শক্ত করে গুরুর থুতনিতে মারি এক ঘুসি। আচমকা ঘা খেয়ে সে ঘুরে

পড়ে যায়। লম্বাটে গড়ন তখন সুপ্রিয়াকে ছেড়ে আমাকে আক্রমণ করে। চকিতে তার তলপেটে সজোরে এক মাইগেরি (বিশেষ ধরনের লাথি)। 'বা-প রে!' বলে সে কুঁকড়ে বসে পড়ে। ইতাবসরে ভাবি চেহারা ভোজালি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। আমি ব্লক করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র হাতে তার কব্জি ধরে দিই মোক্ষম মোচড়। সে আর্তনাদ করে ওঠে। ফানুসের মতো চুপসে যায়। তার হাত থেকে খসে পড়ে অস্ত্র। ক্যারেটে জানতুম বলে এতক্ষণ লড়েছি। গুরু ধাঁ ক'রে সে-টা কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে তাক করে। আমি তখন দু'পা পিছিয়ে যাই। আর সে ক্রোধে দানবের মত পা ফেলে এগিয়ে আসে। সুপ্রিয়া পেছন থেকে তার কোমরের বেল্ট টেনে ধরে। আর তক্ষুনি আঘাত হানতে আমি বুটসুদ্ধ ডান পা তুলি। পা তোলা অবস্থায় ভোজালির খোঁচা লাগে।আমার পায়ে। ভ্রূক্ষেপ না করে তার হাত থেকে ভোজালি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আঘাত হানতে উদ্যত হই। সে তখন সুপ্রিয়াকে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে ভীতু জন্তুর মত পেছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। চেলারাও তার অনুসরণ করে। তখন দিনের আলো নিবে গেছে। ময়দানের ভেতর আবছা অন্ধকারে তারা গা ঢাকা দেয়।

তখন আমার গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরছে ফিনকি দিয়ে। হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরি। যন্ত্রণা হচ্ছিল। সুপ্রিয়া শাড়ির আঁচল ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল।

'এ কী করছো? বাড়িতে কী বলবে?'—আমি আপত্তি জানাই।

'সে ভাবনা তোমার নয়।' আমার পা কাপড়ের ফালি জড়িয়ে বেঁধে দেয় সুপ্রিয়া। তার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে থাকি। গাড়িতে উঠে বসি। সুপ্রিয়া গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। রাস্তায় তখন আলোর ঝর্ণা শুরু হয়ে গেছে।

এস, এস, কে, এম হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হয়েছিল বুঝি থামবে। আমার মনোভাব বুঝে সুপ্রিয়া বলে, 'আমার বাবা শল্য-চিকিৎসক। জানো না? তাই। হাসপাতালে না ঢুকে সোজা বাড়ির দিকে।'

আমার পা থেকে রক্ত ঝরে। শাড়ির ব্যাণ্ডেজ ভিজে থসথস্। হঠাৎ গাড়ির গতি যায় কমে। রাস্তা একেবারে যাচ্ছেতাই। ট্রাফিক আলোর লাল-চোখ দেখে মোটর-বাস-ট্রাক,জট পাকিয়ে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়ার মুখে বিরক্তির ছাপ। সেই জ্যাম-জটের ফাঁক-ফোকর গলে কোন-মতে গাড়ি বার করে আনে সুপ্রিয়া। তারপর সোজা নিউ আলিপুর।

গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে সুপ্রিয়া। বাস্তবিক তখন আমার কাহিল দশা।

বাড়ি তো নয়। যেন স্বপ্নময় রঙমহল। বাড়ির নিচে তলায় সুপ্রিয়ার বাবা ডাঃ চৌধুরীর চেম্বার। ঢুকে পড়ি। সুপ্রিয়া ময়দানের ঘটনার কথা বলে। শুনে ডাঃ চৌধুরীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। 'উচিত হয়নি ওভাবে মাঠে বসা।' তিনি বলেন।

'বাবা, আমরা তো জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছি না। খোলা-মাঠে বসা কী অপরাধ? সুপ্রিয়া জবাব দেয়।

'রাজত্বটা কেমন সেটা তো টের পেলে।' ডাঃ চৌধুরী বলেন, 'এবার থেকে সাবধানে ওঠা-বসা কোরো। একা তো নয়ই। আজ ভাগ্যিস মানব সাথে ছিল।'

ডাঃ চৌধুরীর সুগঠিত সুদর্শন চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ-বয়সেও কী সুন্দর স্বাস্থ্য। গৌরবর্ণ। মাথা জোড়া টাক। ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ার মতো। তাঁর চলনে বলনে চাহনিতে বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

ডাঃ চৌধুরী ব্যাণ্ডেজ খুললেন। ক্ষত দেখে যেন চমকে উঠলেন। স্থাণুর মতো তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। অবাক চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নেন।

'সাংঘাতিক কিছু কী?' আমি বলি।

'নাহ্। কিছু না।' ডাঃ চৌধুরী আমায় আশ্বস্ত করেন।

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-শেষে বেশ মিষ্টি গলায় ডাঃ চৌধুরী বলেন, 'সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকে যাও। কেমন?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই।

তারপর আমি দোতলায় উঠি। সুপ্রিয়া ও দারোয়ান জান-বাহাদুর আমাকে সিঁড়ি ভাঙতে সাহায্য করে। সুপ্রিয়ার মায়ের সাথে দেখা সিঁড়ির মুখেই। কী কমনীয় মুখ। মাধুর্যমণ্ডিত। বিস্ময়ে চমকে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমাকে দেখে। ঘটনা শুনে, তাঁর কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বেগ ফুটে ওঠে। 'সাবধানে নিয়ে যা, সেতু।' তিনি বলেন।

'সেতু।' ওর ডাকনাম বুঝি। কী মিষ্টি। শুনিনি তো আগে।

সকালে শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হয়। পা-টা যা একটু যন্ত্রণা দিচ্ছে। তা দিক। হয়তো ভালর জন্যে। কষ্টের মধ্যেও ইষ্ট লাভ। শাপে বর আর কি!

সেতু এল। নীলাম্বরী শাড়ীতে যেন নীল পরী। হাতে তার ধূমায়িত কাপ। মাথায় এলো খোঁপা। কপালে কাঁচপোকার টিপ্। হাসি মুখ। কী ভাবছো এতো?'

'ভাবছি তোমার বাবা-মা'র কথা। তুমি চা খাবে না?'

'বাবা আসুক।'

'কোথাও গেছেন না কী?'

'পুজো করছেন।'

'বল কী? কোন্ ঠাকুর?'—আমি বিস্মিত।

'গোঁসাইজী। মানে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'অবতার-টবতার বুঝি?'

'তা তো জানি না। তবে তিনি আমাদের গৃহ-দেবতা, বাবা মা ভাই বন্ধু—যা বলো, তাই। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে — সব সময় তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন।'

ভাবাবেগে সেতুর চোখ ছলছল করে।

'বলো কী? তবে ও সব পুজো-টুজো, ধর্মটর্মে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

বলি: 'কারো বিশ্বাসের ওপর আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার ব্যক্তিগত মতামত—ঠাকুরপুজো মানে ধর্মীয় উৎসব। মন্দির, পুজো-মণ্ডপ—সবই উৎসবের আখড়া। ধর্ম হচ্ছে নিছক প্রাণহীণ শুষ্ক অনুষ্ঠান মাত্র। হিন্দুধর্ম বলতে বুঝি.—বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের ধর্ম। তাদের মধ্যে নেই কোন সমন্বয়। বিজ্ঞানের আলোকে ভারতের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী ধর্মগুলো আজ অনেকাংশে নিষ্প্রভ। তাই মাথা চাড়া দিয়েছে এবং দিচ্ছে জঙ্গীসুলভ মৌলবাদ। অত্যুৎসাহী কিছু সংখ্যক মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মানবতাবোধ। এখন ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক মুনাফা-লোটার যন্ত্রবিশেষ। ধর্মের নামে নির্বিচারে চলেছে দমন-পীড়ন-শোষণ-হত্যালীলা। তাই দেখে মানুষ আজ হতাশ আর দিশাহারা। মানুষে মানুষে দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।'

সেতু চুপ করে শুনছিল। আমি উৎসাহিত হই। বলতে থাকি—'তোমাদের পুজোটুজো আত্মার কোন উন্নতি করতে পারে কিনা—সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেউ করে লক্ষ্মীদেবীর পুজো, কেউ যম-

রাজের। কেউ-বা করে ভূত-ঠাকুরের পুজো। হক কথা হলো, রোজগার। ভক্তি-টক্তি বাজে।'

'যমরাজের?' সেতুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

আমি বলি, 'যমরাজ হলেন মৃত্যুর দেবতা। ডোমদের দেবতা। তাঁর অনুগ্রহেই তো তাদের বেঁচে-বর্তে থাকা।'

সেতু হেসে ওঠে। সে বলে, 'ঠিক। তবে গোঁসাইজী-প্রবর্তিত সাধন এ-রকম কোন ধর্মের আওতায় পড়ে না। এ-সাধনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। আচার-অনুষ্ঠান পালনে নেই কোন বাধ্যবাধকতা। পুজো-উপাচারের কোন বালাই নেই। কোন বিশেষ দেবমূর্তিকে যে পুজো করতে হবে সেরকম কোন নির্দেশ নেই। নেই কোন গোঁড়ামি ভাব। সহজ সরল পন্থা। অথচ রহস্যময়। গোঁসাই-ভক্তরা সাধন করেন অতি গোপনে। কাকে-কোকিলে টের পায় না। এ-সাধন আত্মোন্নতির দিশারী। নিয়মিত সাধন করলে অল্প সময়ের মধ্যেই সাধকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। এক অভিনব নৈতিকবোধে সে উদ্দীপিত হয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে।' বলতে বলতে আবেগে সেতুর চোখে অশ্রু দেখা দেয়। 'যাই বাবা এসে পড়বেন।' বুঝলুম সে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চায়।

সেতু চলে গেল। আমার চিন্তাধারা তখন ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। কে সেই গোঁসাইজী? যাঁর অলৌকিক শান্তির সুশীতল ছায়াতলে সমস্ত পরিবার নিরুদ্বেগ ও নিরাপদ। ডাঃ চৌধুরীকে কত গম্ভীর দাম্ভিক আর রাশভারি বলে মনে হয়। চলনে-বলনে খাঁটি সায়েব। তাঁর ধর্মের কোন বাহ্যিক আড়ম্বর নেই। নিজের পেশার জগতে তিনি দিনরাত চরকির মতো ঘুরে বেড়ান। অথচ এ-হেন ব্যক্তির অন্তর্লোকে ধর্মের স্রোত বইছে ফল্গুর মতন। আর সেতু? সে-ও আধুনিকা প্রগতিশীলা। কী প্রগাঢ় বিশ্বাস তারও! আশ্চর্য!

আমি কাপে চুমুক দিলুম।

সেতুর বাড়িতে আমার দিন কাটে। কত-না আরামে। তার ঘরে আমরা দুজনে মিলে পড়াশোনা করি। এক রোববার বিকেলে। সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল—অন্ধত্বের কারণ। সে চোখ বুজে এক-দুই-তিন ক'রে কারণগুলো বলতে থাকে। তখন প্রশস্ত গবাক্ষ বেয়ে কমলা-রঙের উজ্জ্বল রোদ্দুর ঘরে ঢুকছে। আচমকা আমার নজর আটকে যায়। ছবি।

আমার ছবি। নিজেকে যেন আবিষ্কার করি। বলি, 'অন্ধরা বোধ হয় আমাদের চেয়ে সুখী।'

সেতু চমকে ওঠে। 'কেন?'

বলি, 'তাদের কোন দৃশ্যের ভালমন্দ বিচার করার শক্তি নেই। তাদের মানস-চক্ষে পৃথিবীর সবকিছুই বুঝি সুন্দর।'

'তোমার হেঁয়ালি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

আমি তখন দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করি। 'ওটা কী করেছো?'

সেতুর মুখে কৌতুকের হাসি ফোটে। 'কেন? এতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?'

'গেছে বৈকি। আগে জানলে ছবিটা তোমায় দিতুমই না। মেসো-মশাই-মাসিমা দেখলে কী তুমুল কাণ্ড বেঁধে যাবে, বলতো।'

'তখন তোমার বয়স তো সবে তেরো। এখনকার চেহারার সাথে কী কোন মিল আছে?

'আহা, তুমি বুঝছ না। মুখের আদল কী পুরোপুরি বদলে গেছে?'

ঠোঁটের কোণায় সামান্য হাসি টেনে সেতু বলে, 'ইস্ কী ভিতু। বাবা মা তো কবেই দেখেছেন।'

'এখুনি সরিয়ে ফেলো।' বলি।

'কেন?'

'অর্থহীন।'

'আমি বুঝব।'

ট্রে হাতে মাসিমা ঘরে ঢুকলেন। তাতে সাজান কাপ আর ডিশ-ভরা সিঙাড়া। তাঁকে দেখে আমরা চুপ করে গেলুম। গাওয়া-ঘিয়ের ভুরভুরে গন্ধ। আমি সিঙাড়া তুলে নিই।

দিন যায়। এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ। সেতুদের স্নেহ-মমতা-ভালবাসার অমিয়-পরশে তাজা হয়ে মেসে ফিরি। বাবাকে চিঠি দিলুম। কাকু এলেন। ঘটনার কথা বলছি, অনন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন। হাতে তাঁর একটা রঙীন মলাটের বই। তাঁরই লেখা। সবে বেরিয়েছে। কাকুর সাথে তাঁর পরিচয় করে দিলুম। 'আপনার সঙ্গে কিন্তু ভাইপোর অদ্ভুত মিল। রঙের মিলটা তো খুবই প্রকট। মুখের ছাঁদেও সাদৃশ্য। আপনার মত টাক নেই বটে, তবে সাহারার আভাস স্পষ্ট। এ-রকম বড একটা দেখা যায় না। আশ্চর্য!'

বিরক্ত হলুম। বলি, 'বাবা-কাকার সঙ্গে বংশধরের মিল থাকা তো স্বাভাবিক ঘটনা। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? জিনের ব্যাপার। আপনি লেখক, বিজ্ঞানী তো নন। বুঝবেন না।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' তিনি বেরিয়ে গেলেন।

হপ্তাখানেক বাদে। এক রোববার সকালে। আমি পড়ছিলুম। অনন্তবাবু এলেন। 'চা খাওয়াবেন?'

বলি, 'নিশ্চয়ই।'

রাখহরি চা দিয়ে গেল। অনন্তবাবু চুমুক দিচ্ছেন আর আমাকে দেখছেন। আমি উত্যক্ত বোধ করি। মনে মনে বলি, 'আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লুম বটে। তাড়াতাড়ি বিদেয় নিলে বাঁচি।' পড়াব দিকে মন দিই। তিনি চায়ের তলানিটুকু গলাধঃকরণ করে কাপটা মেঝের ওপর রাখলেন। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছলেন। 'আচ্ছা মানুবাবু, জিনের ব্যাপারটা কী? খুলে বলবেন?'

'নিশ্চয়।' আমি বলতে থাকি: 'আমাদের প্রতি দেহকোষে, কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াসে), ক্রোমোজোম নামে একটি পদার্থ আছে। এর মধ্যে থাকে কয়েক হাজার জিন (Gene)। জিন প্রধানতঃ তৈরী হয় ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এ্যাসিড (D. N. A) দিয়ে। ক্রোমোজোমের সংখ্যা হলো তেইশ জোড়া। এব মধ্যে বাইশ জোড়া হলো সাধাবণ ক্রোমোজোম। এদের বলে অটোজোম। বাকি এক জোড়া হলো যৌন-ক্রোমোজোম। এটি নির্ধারণ করে নারী-পুরুষের বিশেষত্ব। নারীর দেহকোষে থাকে বাইশ জোড়া অটোজোম এবং 'xx' নামে একই ধবণের দুটি যৌন-ক্রোমোজোম। পুরুষের কোষে থাকে বাইশ জোড়া অটোজোম এবং 'xy' নামে দু'ধরণের একটি করে যৌন-ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমগত পার্থক্যই হলো নাবী-পুরুষের পার্থক্যের হেতু। আমাদেব বংশগতি (Heredity)-র জন্য দায়ী হলো জিন। ডি. এন. এ. বহন করে পিতা-মাতা সহ পুর্বপুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কার, চারিত্রিক বিশেষত্ব এমন-কি রোগও।'

এমন সময় বাবা-মা উপস্থিত হলেন দু'দিদিকে নিয়ে। অনন্তবাবুব সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করে দিলুম।

'চলি। আপনারা গল্প করুন।'

পরের দিন সন্ধের পর পড়ছি। অনন্তবাবুর ফের আবির্ভাব। বিছানার ওপর ধপাস করে বসলেন। 'চা।'

আগের দিনের মত রাখহরি চা এনে দেয়। অনন্তবাবু অল্প অল্প করে খাচ্ছেন আর কী যেন ভাবছেন। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমার পাঠে মন তেমন বসে না। 'আব এক কাপ খাবেন?' বিদায় করার অছিলায় জিগ্যেস করি।

'না। ধন্যবাদ।' তিনি আমার মুখের পানে সোজাসুজি তাকালেন, 'একটা জিজ্ঞাসা ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার ঐ জিন-তত্ত্ব— ।'

'হ্যাঁ। কী হয়েছে?'

'স্রেফ গোঁজামিল।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন নয়?' তিনি বলেন, 'আপনার সাথে আপনার বাবা-মা-বোনেদের মিল কোথা? তাঁরা তো ঘোর কালো। আপনার বাবার মাথা-ভর্তি চুল। তাঁদের মুখের গড়নও আলাদা। আপনার বাবা-মায়ের সাথে বরং বোনেদের মিল আছে। মুখের আদলে কত সাদৃশ্য। অথচ কাকুর সাথে আপনার চেহারার খুব মিল। এ-রকম অমিলের কারণ কী? জিন-তত্ত্ব তো খাটছে না।• কিছুতেই রহস্যের কিনারা করতে পারছি না। তাই বলছি— ।'

'এই কথা।' আমি মুখে হাসি ছড়িয়ে দিলুম। দেহকোষের বংশ-কণিকা বা জিন নির্ধারণ করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। নিউক্লিক এ্যাসিডের সামান্য আণবিক পরিবর্তন ঘটলে একই বংশ-কণিকার পৃথক রূপ হয়। ভ্রূণের সৃষ্টিকালে পিতা-মাতার বংশ-কণিকার মিশ্রণ ও নূতন বিন্যাস ঘটে। তাই এ-রকম জন্মগত পার্থক্য।

অনন্তবাবু আর কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি বুঝেছেন কিনা বোঝা গেল না। তবে চোখ-মুখ দেখে মনে হোল, বেশ কিছুটা অবাক হয়েছেন। যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

আমি পড়ায় মন দিই।

॥ ছয় ॥

ফাইনাল পরীক্ষার পাট চুকে গেল। দুঃখিনী মায়ের টানে, ভিটের টানে, গ্রামের টানে মন আমার আকুল হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে-কি, কলকাতায় একটানা দীর্ঘদিন থেকে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলুম। পিচ-ঢালা সড়ক ছেড়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পা বাড়াই। ক্রমশঃ আমি গ্রামের কাছাকাছি হই। স্ফূর্তিতে আমার ফুসফুস ভরে ওঠে বিশুদ্ধ বাতাসে। নীলাকাশে তখন রঙের খেলা। বড়পুকুরের জলে তার প্রতিফলন। গোধূলির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসে আজানের সুর আর শঙ্খ ধ্বনি। মন উদাস হয়ে যায়। মাকে দেখার তীব্র আকাংখায় আমার গতি যায় বেড়ে। বাড়ি পৌঁছই। দেখি, তুলসী-মঞ্চের ছায়াতলে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে মা একা নিশ্চুপ বসে আছেন। আমায় দেখে তিনি আনন্দে বিহ্বল। 'এসেছিস্। ক'দিন ধ'রে মনটা অস্থির-অস্থির করছিল। আহা বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। কালো হয়ে গেছিস।' পড়ার চাপে সত্যই দীর্ঘদিন রাত্রি-জাগরণে আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা শীর্ণ ও মলিন হয়ে গেছিল। মায়ের দৃষ্টি এড়াল না। কী আশ্চর্য !

'মেসে কী আর বাড়ির মতো খাওয়া হয়, মা। তাছাড়া পরীক্ষার চাপ।'

'তা ঠিক। শহরে পাথর-ভোগ আতপ চালের ভাত তো। কলের জলও তেমনি। এখানে কিছুদিন থাকলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর কাকু এলেন। তার খানিক পরে বাবা। আমি পরীক্ষা ভালভাবেই দিয়েছি শুনে তাঁদের মুখে হাসি দেখা দেয়। তবে বাবাকে একটু নিস্তেজ মনে হলো। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর বয়স যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে রোয়াকে বসে আছি। তখন চা-পর্ব জমে উঠেছে। কাজল-মাসির কথা উঠল। আন্ত্রিকে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। শুনে, আমার বুকের ভেতর মুসড়ে ওঠে। কাকু একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

'বরং মরে বেঁচে গেছে। আন্ত্রিক-ভূত এখন গাঁয়ের আনাচ-কানাচে। ঠেকাবে কে ? সরকার ? গাঁয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ? ভোট-কুড়ুনী সরকারের ভ্রূক্ষেপ আছে ? পঞ্চায়েতের দাক্ষিণ্যে যা দু'-একটা নলকূপ আছে তা-ও খোঁড়া। তাতে প্রয়োজন মেটে কতটুকু ? রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা আছে ? সুলভে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ? তাহলে গাঁয়ে আছে কী ? শুধু যে যার গদি আগলাতে ব্যস্ত। স্বাধীনতার এ-ত

বছর পরেও এ-কথা ভাবা যায় ? এ এক অসহনীয় অবস্থা।'

কাকুর ক্ষোভ দেখে আমি বিচলিত হই।

'ঠিক আছে, কাকু। ডাক্তার হয়ে আমি গ্রামে ফিরে আসব। অসহায় গরিবদের পাশে দাঁড়াব।'

'হ্যাঁ, তা যদি পারো, ঈশ্বরের সেবা করা হবে। সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।'

কাকুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

একদিন চারু-পিসির বাড়ি গেলুম। তাঁর করুণ-অবস্থা দেখে বড্ড মায়া হলো। বয়সের গুরুভারে জবুথবু। বাড়ির বাইরে বড় একটা বেরোতে পারেন না। দৃষ্টির জোর ক'মে গেছে। চোখে ঘসা-কাচের চশমা। একদিকের ডাঁটি নেই। সুতো বাঁধা মাথার চুল দুধ-সাদা। আমাকে দেখে তিনি 'ননী-চোরা' বলে খুব আদর করলেন। তখন শৈশব-কৈশোর জীবনের ছবিগুলো জলজল করে ওঠে।

এখন পিসিকে দেখার কেউ নেই। সম্বল বলতে একখানা টালির ঘর আর গোটা-কতক গাই গরু। দুধ বেচে সংসার চলে। দারিদ্রের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসিটুকু অটুট ও অম্লান। তিনি আমার বুক-পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। বললেন, 'পাশের খবর বেরোলে আমায় জানাবি। বাবা বুড়ো-শিবের কাছে মানত করেছি। পুজো দেব।'

ফিরে আসছি। পেছনে বুটের শব্দ—ঘটাং ঘটাং। ফিরে দেখি, জামাই। হাতে কি ওটা ? চকচক করছে। ছুরি নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসছে। পরনে খাকি প্যান্ট-জামা। চোখ জবার মতন লাল। মুখে ভক্‌ভক্ গন্ধ। পাশে এসে দাঁড়াল। এক পলকে জরিপ করে নিল আমার আগা-পাশতলা। গোঁফের আড়ালে ধূর্ত হাসি। দেখে, কেঁপে উঠি বটে তবু সাহস হারাই না। বরং গম্ভীর হয়ে গেলুম। তার হুংকার শোনা গেল : 'আই বিপুর বেটা। ডাক্তার হচ্ছিস ! বহুত আচ্ছা। মালকড়ি কী আছে ছাড়ো তো বাবা।'

একটা উত্তুঙ্গ উত্তেজনা আমার রক্তে টগ্‌বগ্ করে ওঠে। চাপা আক্রোশে বলে উঠি, 'বাজে বকবেন না। স্টপ।'

জামাই আর-একবার আমার সর্বাংগে চোখ বুলিয়ে নিল।

'বিপু-বেটা এক নম্বর লম্পট। জোচ্চোর। চিট। দিনরাত ওখানে পড়ে আছে। পেলে, ফুঁড়ে দিতুম।' সে ছুরিটা উঁচিয়ে ধরে। যেন আমাকেই ফুঁড়ে দেবে।

হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। মাইগেরি হাঁকাব কিনা চিন্তা করি।

'কী দেখছিস ? ব্লাডি রাস্কেল। বের কর। নইলে লাশ ফেলে দেব।'

বিপদের মোকাবিলায় আমি তখন প্রস্তুত হলুম। আস্তিন গুটিয়ে ফেলি। হাতের মুঠি শক্ত। গলা চড়িয়ে বলি, 'আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। খামোকা গায়ে পড়ে ঝামেলা পাকাবেন না। কাকুর সম্বন্ধে আর-একটা কথা বলেছেন কি,—আমিও লাশ ফেলে দেব। ইতরের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি।'

'বটে।'

ইতিমধ্যে তামাশা দেখতে বেশ ভিড় হয়েছে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। মোটা, বেঁটে, বয়স্ক। ভারিক্কি। জামাইকে জোরে ধমকে ওঠেন। 'চ-উ-প। এই কী ভদ্দরলোকের আচরণ ? লজ্জা করে না ?' জামাই একেবারে ভড়কে গেল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখনি জনতা এগিয়ে আসবে। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যেতে পারে। জামাই সরে পড়ল।

তখন আঁধার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ডাক্তার-কাকার সদর দরজায় পৌঁছই। ডাক্তার-কাকা মানে অরবিন্দ ডাক্তারবাবু। বাড়ির সামনে একটা বট গাছ। দরজার পাশে চেম্বার থেকে গবাক্ষপথে আলোর ফোকাশ পড়ছে। আমি উঁকি দিয়ে দেখি, ডাক্তার-কাকা চেম্বারে বসে বই পড়ছেন। আমি পায়ে-পায়ে চেম্বারে ঢুকি। সারা ঘর জুড়ে আলোর প্লাবন। ব্যাটারি। কাকাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি বসতে বলেন।

আমি ঘটনার খুঁটিনাটি বলি। শুনে, তিনি ম্লান হাসলেন। 'চরিত্রহননের চেষ্টা আর-কি। সারা দেশজুড়ে এই অপচেষ্টা চলছে। তোমার কাকুর নামে কিছু কেচ্ছা আমার কানে যে আসেনি তা নয়। তোমার বাবা-মা-বোনেদের গায়ের রঙ কালো। আর তুমি ফরসা। এ-সব দেখে গাঁয়ের কিছু অজ্ঞ লোকের সংশয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তোমার কাকু নিঃসন্তান। তাই হয়তো তিনি তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। যাক্, এ-সবের বদলা না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন গণতান্ত্রিক দেশে চলেছে ঘোর মস্তান-যুগ।' একটু থামলেন।

বললেন, 'তুমি তো জানো—জিন-সজ্জার হেরফের হলে জন্মগত পার্থক্য ঘটে। নতুন করে বলার কিছু নেই। এতক্ষণ এই ব্যাপারটাই পড়ছিলুম। দেখতে পার।' ডাক্তার-কাকা একটা মেডিকেল জার্ণেল আমার হাতে দিলেন।

জিনতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আমার আছে। সে-টা ঝালিয়ে নিলুম।

'নিউক্লিয়াসের ভেতর সুতোর মতন যে পদার্থকে বলে ক্রোমোজোম—সেটি তৈরী হয় ডিঅক্‌সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (ডি এন এ), রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (আর এন্ এ), হিস্টোন ও অহিস্টোন জাতীয় প্রোটিন দিয়ে। জিন আসলে ডি. এন. এ. ছাড়া কিছু না। জিনগুলো দেখা যায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে। বংশগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে জিন বা বংশকণিকা। প্রকৃতপক্ষে জিনই জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক। এদের কাজকর্ম খুবই রহস্যপূর্ণ। সব জিনের কাজ একরকম না। আবার সমস্ত জিন এক সঙ্গে কাজ করে না। এরা থাকে কখনো সক্রিয় কখনো-বা নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় জিন আবার হঠাৎ জেগে ওঠে নানাপ্রকার অঘটন ঘটাতে পারে।'

আমি পড়তে থাকি: 'আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র—এ-সব নির্ভর করে পিতা-মাতা তথা পূর্বপুরুষের বংশ-কণিকার ওপর। তবে অনেক সময় একই পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততির মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন এক ভাইয়ের গায়ের রঙ ফরসা অপর জনের কালো। একজনের নাক খাড়া, অন্যের চেপটা ইত্যাদি। এতো গেল দৈহিক পার্থক্য। গুণগত তারতম্য হয়। যেমন একভাই সাহসী, আর এক ভাই ভীরু-প্রকৃতির। এরূপ বৈষম্যের কারণ কী? অনেক সময় জিনের হঠাৎ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়। তাদের নূতন বিন্যাস ঘটে। তাই এই বৈসাদৃশ্য।'

পড়াশেষে আমার মনের মধ্যে বেজে ওঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। আমি সোজা হয়ে বসি। ডাক্তার-কাকা বলেন, 'এখন তো বুঝতে পারলে, বাবা। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর মিছে কেটে গেছে। শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশেষ কাজে লাগানো হয়নি। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি সচেতনতা বাড়ানো হয় নি। এখনো বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর বা অর্ধসাক্ষর। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সমাজের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে নি। যেখানে এই অবস্থা, সেখানে তুমি আর কী আশা করতে পারো? বসো। আসছি।'

ডাক্তার-কাকা বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমি একা বসে থাকি। একটু পরে কল্পনা ঘরে ঢোকে। হাতে রেকাবিতে মিষ্টি আর গ্লাসে জল। টেবিলের ওপর রেখে সে অল্প হাসে। 'মা চা আনছেন।'

কল্পনা আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। ডাক্তার-কাকার একমাত্র সন্তান। বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। দেহে-মনে কলেজের হাওয়া। শার্ট-ট্রাউজারের আবরু ঠেলে তারুণ্যের সাবলীল প্রকাশ।

'মিষ্টি আনলে কেন? মিষ্টি আমি খাই না। ডায়াবেটিসের ভয়।'

'ওমা, মিষ্টি খাবেনা অসুখের ভয়ে? তবে তো আইন করে মিষ্টির দোকান তুলে দিতে হয়।'

'বাবার এ-রোগ আছে কিনা। তাই আগে থেকে সাবধানে থাকা।'

'বাবার আছে বলে ছেলেরও হবে নাকি?'

'হতে পারে। জিন-এর ব্যাপার। বুঝবে না।'

'হবেই যে তা তো নয়।' কল্পনা এক টুকরো সন্দেশ আচমকা আমার মুখে গুঁজে দেয়। বিষম লাগে। সে-সময় কাকিমা উপস্থিত হলেন। কাপ-ডিশ টেবিলের এক পাশে নামিয়ে তিনি আমার মাথায় ফুঁ দিতে থাকেন। বলেন, 'এক ঢোঁক জল খেয়ে নাও।' নিজেই গ্লাসটা আমার মুখে তুলে ধরেন। কয়েক ঢোঁক খেলুম। হেঁচকি থেমে গেল। তিনি সহাস্যে বলেন, 'কড়া-পাকের সন্দেশ কিনা। আগে জলে গলা ভিজিয়ে নিতে হয়।'

সন্দেশ ও চা খেলুম। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, ডাক্তার-কাকা এলেন। বললেন, 'যে ক'দিন আছো, মাঝে মাঝে এসো।'

তখন রাত্রি নেমেছে। আট-টা হবে। শহরে এমন-কিছু রাত্রি না। তবে পাড়াগাঁয়ে গা ছমছম করে। থমকে দাঁড়াই।

'কে?'

'আজ্ঞে, বলা।'

টর্চ জ্বালি।

'খোকাবাবু? কোথা গেছিলে?'

'ডাক্তার-কাকার বাড়ি।'

বলা মানে বলাই দাস-বাউল। আমাদের গ্রামেরই বাসিন্দা। শেষ-প্রান্তে তার কুঁড়ে। সে ছিল কাকুর হাল কিষেন। মাসিক বেতনে কাজ করত। আমি তখন খুব ছোট। সে আমায় 'খোকাবাবু' বলত আর আমি বাউল-মামা বলে ডাকতাম। আনন্দ হল অনেকদিন পরে ওকে দেখে।

'কেমন আছো ?' আমি জিগ্যেস করি।

বাউল-মামা বিষণ্ণস্বরে বলে, 'আমি তো আছি একরকম। বাড়ির খবর ভাল নয়, খোকাবাবু ' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'মন্দ কপাল। নাতিটার কয়দিন ধরে জর। লেতিয়ে পড়েছে। বুকের দুধ টানতে পারছে না। তাই লগেন কবরেজের কাছে যাচ্ছি।'

'সে কী। গাঁয়ে পাশ-করা ডাক্তার থাকতে— ?' আমি বিস্মিত হই।

বাউল-মামা নিজের কপালে করাঘাত করে। 'কী যে বলো খোকা-বাবু ? সে পয়সা কোথা ? গতর পড়ে গেছে। মনিষ খাটতে কেউ আর ডাকে না। গলাও ধরে ধরে যায়। বেশীক্ষণ গাইতে পারি না।'

আমি বিচলিত হই। বলি, 'চলো, দেখি।' রাস্তা ছেড়ে আমরা নামি খেনো মাঠে। আলরাস্তা। অসাবধানে পতনের সম্ভাবনা। বাউল-মামা কিন্তু চলেছে স্বচ্ছন্দে। পরনে খাটো বহরের ধুতি। খালি পা। আদুর গা। হাতে কঞ্চির ছড়ি।

একটু উঁচু জায়গায় রাংচিতার বেড়া-ঘেরা দু'কুঠরির মাটির ঘর। খড়ের ছাউনি। সামনে এক টুকরো উঠোন। গোবরের হাল্কা প্রলেপ। একধারে লাউ মাচান। ঘরের দরজা বুক-সই উঁচু। পাশে একটা মিশকালো কুকুর শুয়ে। টর্চের আলো ফেলতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমি মাথা বাঁচিয়ে, নিচু হয়ে ঘরে ঢুকি। দেখি, বাউল-মামার ছেলের বউ ছেলে-কোলে বসে আছে মাদুরের ওপর। বাচ্চার মাথার চাঁদিতে জলপটি চাপিয়ে হাত-পাখার হাওয়া দিচ্ছে। সামনে একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। পাছে মাটির কুঁজো। সব কিছুর মধ্যে দারিদ্র প্রকট। ভাবি নিরন্ন ক্ষুধার্ত অশিক্ষিত দুর্দশা-ক্লিষ্ট কৃষক-সমাজের কাছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো শুধু কল্পনা ছাড়া আর-কি। হঠাৎ বাচ্চাটা ককিয়ে ওঠে। আমি সংবিৎ ফিরে পাই। ছেলেটিকে পরীক্ষা করি। বছর খানেকের ছেলে। দেহে পুষ্টির অভাব। গলার ভেতরটা দেখি। ডিপথেরিয়া। তাকে হুগলী সদর-হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য পরামর্শ দিয়ে বাউল-মামার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিই।

বাড়ি ফিরছিলুম। বাউল-মামা সঙ্গে চলেছে। বুঝতে পারিনি, আচমকা একটা কুকুর ঘেউ করে আমার পায়ে কামড় দেয়। বোধ হয় ওর গায়ে পা পড়েছিল। টর্চের আলো ফেলে দেখি, বাঁ হাঁটুর নিচে ডিম থেকে এক খাবলা মাংস তোলা। প্যান্টের খানিকটা ছিন্ন। রক্ত ঝরছে। মাথা

ঝিমঝিম করতে থাকে। বাউল-মামা নিজের কাপড়ের খুঁট ছিঁড়ে ক্ষত বেঁধে দেয়। দুজনে হাঁটতে থাকি। সোজা গিয়ে উপস্থিত হই ডাক্তার-কাকার চেম্বারে। বাউল-মামার নাতির কথা বলি। ডাক্তার-কাকা সে-রাতের মতো কিছু অষুধ দেন। বাউল-মামা চলে যায়।

ততক্ষণে ক্ষতস্থান সাবান-জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করেছে কল্পনা। কারবলিক অ্যাসিডে ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দেন ডাক্তার-কাকা। সে কী জ্বালা! কল্পনা হাত-পাখায় বাতাস করে। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বলুনি কমে। ডাক্তার-কাকা ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একটা টিটেনাস টকসয়েড ইনজেকসান দেন। এবার স্থির হয়ে বসি। কাকিমা গরম কফি দেন। তাতে কাজ হয়। দেহমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ডাক্তার-কাকা হাত ধুয়ে আমার সামনে চেয়ারে বসলেন। 'জলাতঙ্কের প্রতিষেধক হিসেবে এ্যান্টিরেবিক ভ্যাক্সিন (এ. আর ভি.) নিতে হবে।'

'নিতেই হবে?'

'হ্যাঁ। বিপদের ঝুঁকি না-নেওয়াই উচিত। আচ্ছা কুকুরটা পোষা না খেপা?'

'মনে হয় বাউল-মামার পোষা।'

'পোষা না কচু। নিজে খেতে পায় না আবার শংকরাকে পোষে।' কল্পনা ফোড়ন কাটে।

ডাক্তার কাকা গম্ভীর। বলেন, 'কুকুরটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে অন্ততঃ দশদিন। তারপরে যদি সে বেঁচে থাকে, বুঝতে হবে পাগলা কুকুর নয়। পাগলা কুকুর সাধারণতঃ ছ'দিনের বেশী বাঁচে না।'

'যদি ছ'দিন পরে মরে যায়?'

'তখন ভ্যাক্সিন নিতেই হবে।'

'দেরি হয়ে যাবে না?'

'তা একটু হবে। তবে ক্ষতি বিশেষ হবে না। ইনকুবেশান-এর কাল তো ছ' থেকে ষাট দিন।' ডাক্তার-কাকা থামলেন। কী যেন ভেবে নিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আগামী কাল থেকেই ভ্যাক্সিন নিতে আরম্ভ কর। আমি-ও এদিকে খোঁজ নিতে থাকি। ছ'দিন যদি বেঁচে যায়, তোমায় খবর পাঠাব। ইনজেকশান নেওয়া বন্ধ করে দেবে। আর যদি খবর না পাও, জানবে, কুকুরটা মরে গেছে। ইনজেকশান চালিয়ে যাবে। পুরো চৌদ্দটাই। কেমন?'

'ঠিক আছে।' আমি উঠে পড়ি।

কল্পনা চলল আমার সাথে। বাড়ি পর্যন্ত যাবে। তার হাতে দু'সেল ব্যাটারির টর্চ। কল্পনা চলে পাশে পাশে। আর আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কল্পনা বলে, 'ইস্ আপনি কী ভী—তু। কত লোককে তো কুকুরে কামড়ায়। কে আর কলকাতায় যায় ভ্যাক্সিন নিতে? সাধন-ওঝার গুড়-পড়া খেলেই বিষ নেমে যেত। বাবার যত্তো বাড়াবাড়ি।'

আমার হাসি পায়। বলি, 'অবৈজ্ঞানিক কথা। কুসংস্কার।'

কল্পনা ঘুরে দাঁড়ায়। 'ভাগ্যিস আপনার মতো বিজ্ঞান পড়িনি। তাহলে কুকুর দেখে ভয় খেতুম; মানুষ দেখে ও।'

'মানুষ?'

'কেন? জামাইকে।'

'সে তো কুকুরের অধম।' আমি ঠোঁট কামড়াই।

আমরা আরো খানিক এগিয়ে গেলুম। সহসা একটা খসখস শব্দ। কল্পনা থমকে দাঁড়ায়। আলোব বৃত্তের মধ্যে রাস্তার ওপব একটা সাপ। কালো। গায়ে ছোপ ছোপ সাদা দাগ। আমি দু'পা পিছিয়ে গেলুম। কল্পনা স্থির দাঁড়িয়ে। সে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। এঁকে বেঁকে সাপটা রাস্তা পার হয়। ঝোপের ভেতব ঢুকে পড়ে। কল্পনা হাসতে থাকে আমাব ভীত ভাব দেখে।

'কী ভীতু! কী ভীতু! অমন সুন্দর জীবটাকে ভাল করে দেখলেন না তো। ঈশ্বরের এ-এক সৃষ্টি।'

আমি বলি, 'ভয়ঙ্কর সুন্দরই বটে। মা মনসার চেলাটি ঠুকে দিলে বুঝতে পারতে।'

'ইস, কী আর হতো? সাধন-ওঝা এক ফুঁয়ে বিষ ঝেড়ে দিত।'

আমি কল্পনার মুখের পানে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি।

'হাঁটুন। এখানেই রাত কাটাবেন নাকি?'

আমি আর প্রসঙ্গ বাড়ালুম না। সতর্ক দৃষ্টি ফেলে হাঁটতে থাকি।

কিছুদূর যাওয়ার পর জিগেস করি, 'আচ্ছা কল্পনা, সত্যি করে বলতো, সাপ-খোপ কুকুর-টুকুর দেখলে তুমি ভয় পাও না?'

'ভয় পাবো কেন? ওদের আঘাত না করলে ওরা ক্ষতি করে না।'

'অন্ধকারে একলা যেতে?'

'ভয়? মোটেই না।'

'কোন যুবকের সঙ্গে যেতে?'

'অচেনা না হলে ভয় কি। আমার ভয় ও-সবে নয়।'

'কী তবে?'

'বয়স। আমার এই বয়স।'

'মানে।'

'ওটা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না।'

যেন খোঁচা।

চুপ করে যাই।

বাড়ির সদর-দরজার কাছে পৌঁছে গেলুম। 'এবার যেতে পারবেন তো?' আবার খোঁচা।

আমার চোখে তখন অন্ধকার সয়ে গেছে। দেখি, অন্ধকারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছে কল্পনা। সে যাচ্ছে আলো না জেলেই। সাহস বলিহারি! ক্রমে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমিও বাড়ির ভেতর পা বাড়ালুম।

মা তড়িঘড়ি উঠোনো নেমে এলেন। হাতে তাঁর লণ্ঠন। পিছনে বাবা ও কাকু। 'এত্তো দেরি? ঠাকুরপো তো খুঁজতে যাচ্ছিল।'

আমি শুষ্ক হাসি। 'কুকুরে কামড়েছে।' ডাক্তার কাকার কাছে যেতে হল।'

'কুকুরে কামড়েছে।' মা রীতিমত শংকিত।

বলি, 'ডাক্তার-কাকা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন।'

'আমি যাচ্ছি সাধনের কাছে।' কাকু তক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন।

কাকু ফিবলেন খানিক বাদে। আমার হাতে শালপাতা-মোড়া কী একটা দিয়ে তিনি বলেন, গুড-পড়া। খেয়ে নাও। বিষ কেটে যাবে।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। মা বললেন, 'খেয়ে নে বাবা। জল দিচ্ছি।'

খেতে বাধ্য হলুম।

পরের দিন ভোর-ভোর আমি বেরিয়ে পড়ি। অপমান-অত্যাচার-দুর্ঘটনা-কুসংস্কারের জের টানতে টানতে সোজা হাজির হলুম নিউ আলিপুর। সেতুর বাড়ি। সেদিনের সব ঘটনার কথা মেসোমশাইকে বলি। তিনি বললেন, 'ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। পুরো চোদ্দটা ডোজই।'

‘কুকুর যদি বেঁচে যায় ?’ আমি সংশয় প্রকাশ করি।

‘তা-হলেও। কুকুরের মধ্যে কেরিয়ার (Carrier) থাকতে পারে।’ মেসোমশাই বলেন।

শুনে, আমি তো হতবাক। এ-রকম নির্দেশ ডাক্তারি-শাস্ত্রে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ল না। ‘আচ্ছা, এতে হাইপারসেন্সিটিভ এর মত দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারে ?’

‘তা অবশ্য পারে।’ মেসোমশাই বলেন, ‘তবে হিউম্যেন ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাক্সিন (H. D. C.) নিতে পার। এতে কোন ভয় নেই।’

‘এখন সমস্যা হচ্ছে, এখানে থাকি কোথায় ? মেসে— ।’

‘মেসে থাকতে যাবে কেন ?’ মেসোমশাই বলেন, ‘আমার ভবানীপুরের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে। বাবা-মাকে নিয়ে সেখানে দিব্যি থাকতে পারো।’

‘তারপরও সমস্যা আছে।’ আমি ইতস্তত করি।

‘কী ?’

‘খরচ।’ বলতেই হল।

মেসোমশাই হেসে উঠলেন।

‘উপায় একটা হয়ে যাবে। এত ঘাবড়ালে চলে ? আমি তো আছি।’

আশ্বস্ত হলুম।

॥ সাত ॥

ফাইনাল এম্. বি. বি. এস্ পরীক্ষার ফল বেরুল। আমি অবাক। বিশ্বাস হয় না। স্বপ্নেও যা ভাবিনি তাই ঘটেছে। আমি প্রথম হয়েছি। সেতুও উৎরে গেছে।

পার্ক স্ট্রীট-এ এক অভিজাত পল্লিতে অতঃপর প্র্যাকটিশ শুরু করি। সে ব্যাপারে মেসোমশাই-এর সাহায্য ছিল। তিনি যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা করে দেন। জীবনের মোড় ঘুরে যায়। একদিন বাবা-মাকে ভবানীপুরে মেসোমশাই-এর বাড়িতে নিয়ে এলুম। স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি।

দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। অর্থোপার্জনের সাথে সাথে চলে আমার মেডিসিনে এম্ ডি. পরীক্ষার প্রস্তুতি। সেতু-ও ধাত্রী-বিদ্যায় এম্ ডি. হবার জন্যে সচেষ্ট হয়।

আমি তখন মেসো-মাসিমার চোখে হীরের টুকরো ছেলে। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে ভেতরে-ভেতরে সুখ অনুভব করি। প্রকৃতপক্ষে মেসোমশাই ছিলেন আমার অভিভাবকের মত। কোন সমস্যায় পড়লে তিনি সমাধানের পথ বাতলে দিতেন। ক্রমশঃ দু'পরিবারের মধ্যে গড়ে ওঠে হৃদ্যতাপূর্ণ মধুর সম্পর্ক। আমার আনন্দ-মুখর দিনগুলো স্বপ্নের মত কেটে যেতে থাকে। এমনি এক স্বপ্ন-বিভোর দিনের কথা বলি :

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছি। দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে সেতু হঠাৎ এসে হাজির। চমক লাগে।

'কী ব্যাপার? এ সময়ে?'

'সময়-অসময় নিয়ে গবেষণা করছো বুঝি?'

আমি তাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিই। 'এখন সে-রকমই বটে।'

'চলো একটু বেরুই।'

'এই রোদে?'

'আহা রোদ পড়লে।'

'আমার যে চেম্বার আছে।'

'থাক চেম্বার। একদিন দেরি করে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

তখন রোদের তেজ অনেকটা কমে এসেছে। বেরিয়ে পড়ি। রাস্তার ধারে মোটর পার্ক করে আমরা অল্প হেঁটে পৌঁছই রবীন্দ্র সরোবরের তীরে। একটা পরিষ্কার তকতকে জায়গা বেছে বসি। আমি সিগারেট ধরাই। সেতুকে দেখি। তার মসৃণ কপালে কয়েকগাছা খুচরো চুল উড়ে-উড়ে পড়ছে। সেতু আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। তার হাতের ওঠা-নামায় বিকেলের রোদ আদরের মত ছড়িয়ে আছে। দেখছিলুম। বলি, 'বাঃ কী চমৎকার বাতাস।'

সেতু হাসে।

'মেমসাব! চীনা বাদাম।' ফেরিওয়ালা।

সেতু দু' ঠোঙা বাদাম নেয়। দু'জনে বাদাম চিবোচ্ছি। সেতু বলে, 'জায়গাটা কী সুন্দর!'

'মজার জায়গাও বটে।'

'কেন?'

বলি, 'জীবনকে এখানে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

'মানে?'

'সোজা। ঐ তো—দেখো না। মেয়েটা কী রকম অদ্ভুতভাবে হাসছে। ভঙ্গিতে কি যেন। বাঁয়ে ঘাড় ফেরাও। দেখো। সুন্দরী না? সুযৌবনা। চোখে রঙীন চশমা। এই বিকেলেও। পোশাকে বুক-পিঠ আঁটা,—কেমন দেখাচ্ছে বলো তো? মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? দেখো, দেখো। ছোকরা তিনটে ওর শরীর নিয়ে খেলা করছে। এই দিবালোকে।'

'লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা ত্যাগ করেই তো ওরা এখানে এসেছে।'

'পুলিশ?'

'সে বন্দোবস্ত আগেই করা থাকে। ওরা এখন আসবে না।'

সেতু গম্ভীর হয়ে যায়।

ভেলপুরীর ঠেলাগাড়ি এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দাম দিয়ে দেয়।

'বুঝলে কিছু?'

'বাঃ, এতে বোঝাব কি আছে। আমিও ভেলপুরী খেতে পারি।'

'পারো। কিন্তু আমি খেতে দেব না।'

'কেন?'

'ওই ভেলপুরীতে মেশানো আছে ড্রাগস—'

'কী করে বুঝলে?'

'ওদের চেহারা আর হাবভাব দেখে। ফুচকা ভেলপুরী হচ্ছে ড্রাগস্ বিক্রির সহজ পন্থা।'

'এভাবে ভেলপুরী খেলে ওদের ভবিষ্যৎ তো—'

'জেনেশুনে বিষপান।'

'এভাবে ছড়িয়ে পড়বে দেশময়।'

'পড়বেই তো।'

সেতুর মুখে আতংকের ছায়া ফুটে ওঠে।

'মজা। মজা দেখবে?' আমার মুখে হাসি।

'আচ্ছা দেখাচ্ছি—'

দেখতে পেয়েছিলুম আর এক ভেলপুরী-বিক্রেতা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করি, আছে না কি?'

বিক্রেতা হেসে চারপাশ দেখে নিল। ঘাড় নাড়ে। দাম জানতে চাই।

'ছোট পুরিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'পনেরো টাকা।'

'বড় পুরিয়া ?'

'পাঁচিশ।'

'দরকার নেই।'

বিক্রেতা চলে যায়।

আমি তখন সেতুকে বলি, 'দেখলে ত।'

'সর্বনাশ !' সেতু শ্বাস ছাড়ে।

'হ্যাঁ সর্বনাশ।'

গানের সুর ভেসে আসে ও-অঞ্চল থেকে। বেয়াড়া সুর। মেয়েটা গান ধরেছে,—মেয়েটাই। আর ছেলে তিনটে তালে তালে টুইস্ট নাচ শুরু করেছে। কোমর দোলাতে-দোলাতে সেতুর পানে দৃষ্টি হানছে। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি।

'অসভ্য ! জানোয়ার !' ক্রোধে ও ঘৃণায় সেতু জ্বলে ওঠে।

উঠে পড়ি। হাঁটতে থাকি। যেতে যেতে সেতু বলে, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'কোকাকোলা খাবে ?'

'না বাবা। কে জানে ওর মধ্যেও ড্রাগস আছে কিনা। বাড়িতে আমরা ফোটান জল খাই।'

তাহলে তো তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করা যাবে না। কলকাতার জল একেবারে না খাওয়াই উচিত।'

সেতু একটু থতমত খেয়ে যায়। 'কেন বলতো ?'

'ক্যানসার হতে পারে।'

'ধ্যাৎ। তোমার যত উদ্ভট কথা।'

'তবে শোন।' আমি বলি, 'পল্‌তা থেকে কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেখানে প্রিক্লোরিনেশন ও পোস্টক্লোরিনেশন প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন মিশিয়ে গঙ্গার জল পরিস্রুত করা হয়। জলে দ্রাব্য অবস্থায় থাকে হিউমিক অ্যাসিড, ফালভিক অ্যাসিড-সহ অন্যান্য জৈব পদার্থ। গঙ্গাজলে এ-সব জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী। এ-রকম জলে সরাসরি ক্লোরিন মিশিয়ে প্রিক্লোরিনেশন করলে হিউমিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটে। গঠিত হয় ট্রাইহ্যালো মিথেন যৌগ। এ-টা কার্সিনোজেনিক

(ক্যানসার উৎপাদক)। খাদ্যনালিতে ক্যানসারের আশংকা।

'তাহলে ঘরে ঘরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়বে যে— ।'

'পড়তেই পারে।' বলি।

'আচ্ছা, ফোটান জল খেলে ?'

'দেখ, এই যৌগ একবার গঠিত হলে জল থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। জল ফোটালেও, না।'

'তাহলে ?'

'যদি বাঁচতে চাও', আমি সেতুকে আশ্বস্ত করে বলি, 'শাক-সব্জী ও ফাইবার-জাতীয় খাদ্য খেতে হবে বেশী পরিমাণে। এর মধ্যে আছে অ্যান্টিকার্সিনোজেনিক উপাদান।'

'বড্ড জ্ঞান দাও তুমি। চলো।'

সামনে মিছিল ছিল সেটা এড়িয়ে আমরা গাড়িতে উঠে বসি। রাস্তা তখন আলোর জোয়ারে ভাসচে। হঠাৎ মোটর থামিয়ে সেতু বলে, 'এসো।'

নেমে পড়ি। রাস্তা ডিঙিয়ে একটা রেস্তোরাঁর সামনে সেতু থামে। 'এসো।'

'আবার ড্রাগস-এর পাল্লায় পড়ব না তো ?' বলি।

সেতু বলে, ভয় পেয়ো না। এখানে ড্রাগস্ নেই, ড্রাংকারস্ আছে। তারা নিরীহ।'

ফটকের সামনে উর্দিপরা দারোয়ান সেলাম ঠোকে। সে কাচের পাল্লা ঠেলে দেয়। আমবা ভেতবে ঢুকি। সেলার পেরিয়ে হলঘরে ঢুকতেই এক রাজকীয় পরিবেশে এসে পড়ি। চারপাশে রঙীন মায়াবী আলোর চমকানি। মাথাব ওপর সুদৃশ্য বাহারি রঙের আবরণ। ভিড় বিশেষ নেই। জনা কুড়ি হবে। তাঁদের পোশাকে বিদেশিয়ানার উৎকট ছাপ। তাঁদের টেবিলে রাশি রাশি খাদ্য-সম্ভার আর বিয়ারের বোতল। আমরা একটু তফাতে বসি। টোস্ট কাটলেট আর কফি দিয়ে যায় ওয়েটার। আমরা সবে কাপে চুমুক দিয়েছি, যন্ত্র-সংগীত বেজে ওঠে। নারী-কণ্ঠের ফিল্মি হিন্দি গান। নজর চলে যায় মঞ্চের দিকে। এদিক ওদিক থেকে শিস হাত নাড়ানাড়ি। দেখি, মঞ্চের ওপরে এক অপূর্ব নারীমূর্তি। বয়স আন্দাজ করতে পারি না, কুড়ি-একুশ হবে। তন্বী শরীর। চোখের পাতায় মাসকারার প্রলেপ। ঠোঁটে ঘন লাল লিপস্টিক। পরনে জরি-বসানো হাল্‌কা আকাশী রঙের স্কার্ট। উদ্দাম গানের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগে

তার শরীরে। তখন মঞ্চে বিভিন্ন রঙের আলোর খেলা। জলছে আর নিবছে।

'সেতু, তুমি কোথায় আসলে?'

সেতু হাসে।

'শহরের কর্মব্যস্ত মানুষ এখানে আসে ক্লান্তি জুড়াতে। একটু আমোদ করতে। তাই নাচ-গানের ব্যবস্থা। এতে দোষের কী দেখলে?'

জিগ্যেস করি, 'আচ্ছা, মেয়েটা কে? ওই যে নাচছে?'

'কে আবার? দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে। ভদ্রভাবে বাঁচার মত কোন চাকরি যোগাড় করতে পারে নি। তাই এসেছে এখানে স্রেফ পেটের ধান্দায়।'

ইতিমধ্যে মেয়েটা চলে যায় পর্দার আড়ালে। আসে এক যুবতী। ঝলমলে জরির পোশাক তারও। উরু ও পেট উন্মুক্ত। সে শুরু করে নাচ। বেজে ওঠে ইলেকট্রনিক অর্গ্যান, গিটার, ঢোল, ড্রামস। আমার চোখে পলক পড়ে না। কী উদ্দাম নৃত্য। বাজনার তালে তালে তার ছন্দান্বিত শরীরের ওপর আলো পড়ে। রূপের বিভা ছলকায়। আলো পড়ে কেশে, চক্ষে, অধরে, বক্ষে, কটিতে, উরুতে। ফিসফিসিয়ে বলি, 'বিশ্বসুন্দরীর প্রতিযোগিতায় নিশ্চয় উতরে যেত '

সঙ্গে সঙ্গে সেতু ধমকে ওঠে, 'থামতো, নারী-সৌন্দর্য সম্বন্ধে, তোমার জ্ঞান কতটুকু? জীবনে ক টা মেয়ের সংস্রবে এসেছো?'

'তা বটে। তা বটে।' চুপসে যাই। তবু রোখ ছাড়ি না। বলি, 'আচ্ছা এ ভাবে কতকগুলো দৃষ্টি লোলুপ পুরুষকে দেহের অ-দেখা অংশ-গুলো দেখিয়ে পয়সা রোজগার করার মধ্যে যুক্তি কোথায়?'

সেতু বলে, 'সেই একই সমস্যা। হয়তো পণ কিংবা দারিদ্র্য।'

'ওরা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করতে পারত ত।' বলি।

'খুব বললে যা-হোক।' সেতু বলে, চলতি শিক্ষানীতি উপনিবেশিকতার চাপে ভুগছে। এ-শিক্ষা পেয়ে বেকার হওয়া সোজা, চাকরিমেলা ভার।'

'তবু একটা প্রশ্ন?'

'কী?'

'ওদেরকে নরকের দ্বার খুলে দিয়ে রোজগারের ফিকির' এ কি অপসংস্কৃতি নয়? সরকার বন্ধ করতে পারে না? নেই কোন আইন?'

'মাথা খারাপ?'

'কেন?'

'আরে, সরকার নিজেই তো অপসংস্কৃতির আড়তদার। এতে মোটা পয়সা রোজগার। বুঝলে?'

'না বুঝিনি।'

'তোমাকে বুঝতে হবে না। সেতু বলে, 'রাজনীতি এসে পড়েছে। আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। চলো উঠা যাক।'

সেতু বেশ দক্ষতাব সঙ্গে মোটর চালাতে থাকে। আমি তার পাশে বসে আছি। মাঝে মাঝে তার মুখ দেখছি। সেও দেখছে আমার মুখ আয়নায়। হেসে ফেলে।

'সেতু, তুমি কী আমাব ওপর রাগ করেছ?' বলি।

'রাগ করব কেন? আশ্চর্য।'

'ইয়ে ঐ নাচিয়ে মেয়েগুলোর, মানে—' আমি ইতস্তত করি।

'রূপের প্রশংসা? নাকি রসের ভিয়েন? দেখ, ওগুলো চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার। আনন্দ পেতে ওখানে যাওয়া। সব সময় নির্মল নাও হতে পারে। এতে রাগ করার কী আছে। বরং অভিজ্ঞতা হল। তাই না?'

'এ-রকম অভিজ্ঞতা না-হলেই ভালো।' বলি, 'জানো, তোমাকে নিয়েই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা। সেটা আবিল হোক তা চাই না।'

সেতু বলে, 'দেখ. নর-নারীর ভালবাসার মধ্যে যদি পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান, শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ না থাকে তবে সে ভালবাসা পাশাখেলার সামিল। বেশীদিন টেঁকে না। ঝরে যায়। বিবাহও অর্থহীন হয়ে পড়ে তখন।'

'বেশ।' বলে ফেলি, আমাদের ভালবাসা তাহলে পাকা হবে কবে?'

'এসে গেছি।' সেতু ব্রেক কষে। 'আমাদের বাড়িতে যাবে না?'

'রাত হয়ে গেছে। অন্য একদিন—'

আমি নেমে পড়ি। সেতুর উত্তর শোনা হল না।

॥ আট ॥

একদিন মেসো-মাসিমা দুজনেই এলেন আমাদের বাড়ি। তখন বিকেল। আমি চেম্বারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। আটকে গেলুম।

তখন চা-পর্ব জমে উঠেছে। মাসিমাই প্রথম কথাটা পাড়লেন। 'দিদি, অনেক দিন ধরে একটা কথা বলবো-বলবো করছি। যদি ভরসা দেন, বলি।'

মা জিবে একটা শব্দ করলেন। 'বলতে গেলে আপনারা আমাদের আপনজন। আমাদের জন্য যা করেছেন তা জীবনে শোধ হবার নয়।'

বাবা বলেন, 'বলুন, স্বচ্ছন্দে।'

'বুঝতেই তো পারছেন, দিদি। আমরা কন্যাদায়গ্রস্ত। আমার সেতুকে আপনার ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে চাই। ভারি মিষ্টি স্বভাবের ছেলে। আমাদের খুবই পছন্দ।'

মায়ের মুখে কোন কথা সরে না। বোধ হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন।

বাবা বললেন, 'এ আমাদের সৌভাগ্য।'

তারপরও কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি বেরিয়ে পড়ি।

হপ্তাখানেক বাদে। এক সকালে হঠাৎ এলেন কাকু। মেসো-মাসিমা এলেন দুপুরে। যা আন্দাজ করেছিলুম—তাই। সকলে মিলে আলোচনার টেবিলে বসেন। পাশের ঘরে আমি উদগ্রীব। কথাবার্তা শেষ অধ্যায় পৌঁছায়। কাকু পাঁজি দেখে বিয়ের দিনক্ষণ ধার্য করেন। একমাস পরেই শুভলগ্ন। উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে পড়ি। সোজা চেম্বারে।

দিন কয়েক বাদে। বিকেলে গেলুম সেতুদের বাড়ি। তাকে দেখতে। ম্যালেরিয়া থেকে সবে সেরে উঠেছে। বিছানায় আধ-শোয়া।

'কেমন আছো?'

'ভাল।' সেতু উঠে বসে। তার অধরে বিন্যস্ত হাসির ঢেউ।

তার কপালে হাত দিয়ে তাপমাত্রা আন্দাজ করি। নাড়ির স্পন্দন অনুভব করি। সেতু স্থিরভাবে বসে থাকে। আমি স্টেথো গুটিয়ে চেয়ারে বসি। ওকে দেখতে থাকি। অসুখে রোগা হয়েছে বটে কিন্তু শ্রী ও সৌন্দর্য তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভাবি, একদিন ও-ই আমার বধূ হবে। শিহরণ জাগে। একটু অন্যমনস্ক হই।

সেতু বলে, 'কী ভাবছো?'

আমি ফিসফিসিয়ে বলি, 'তোমাকে।'

'আমার কী ভাগ্য!' সেতু হাসে। বলে, 'মনে করেছিলুম বেস্তোরাঁর সেই নাচিয়ে-মেয়েটিই বুঝি তোমার হৃদয় জুড়ে আছে।' হাসতেই থাকে।

মাসিমার পায়ের শব্দ শুনে সেতু সরে বসে। খাবার আর চা নিয়ে আসেন তিনি।

চেম্বারের সময়। উঠে পড়ি। ট্যাকসি ধরি। দেবি হয়ে গেছে।

মন উড়ে যায় সুদূর কল্পলোকে। সেতুব স্বপ্নময় ছবি আঁকতে থাকি। আমার একটু ঢুলুনি আসে। দেখি, সেতু এক-গা জড়োয়া পড়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ভঙ্গিতে লজ্জা। অথচ শরীরে বুঝি উত্তেজনাব অন্তঃস্রোত। আমি মুগ্ধ। তার চোখে চঞ্চল কটাক্ষ। আমাব তৃষিত চোখ জুড়ায়, জুড়ায় আমার প্রাণ। দেখি, বিপুল জাঁক-জমকপূর্ণ এক অট্টালিকা। বিবাহের গন্ধমাখা বাতাস ভরপুর। বোমাঞ্চিত হই। হঠাৎ বিকট শব্দ। ঘুম ছুটে যায়। স্বপ্ন ভেঙে তছনছ। চোখ খুলে দেখি—হাজরা মোড। আবার জোর ঝাঁকুনি খেলুম। চোখে নেমে আসে জমাট অন্ধকার। আব কিছু জানি না।

সম্বিত ফিরলে ক্লান্ত চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখি, এ যে হাসপাতাল। বিছানায় শুয়ে আছি। ডান হাতে শিরার ভেতর বক্ত ঢুকছে ফোঁটা ফোঁটা। নাকে নল লাগালো। অক্সিজেন ঢুকছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। বাঁ হাতেও। টনটন করে। সারা দেহে অসহ্য ব্যথা। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বাবা-মা-কাকু-মাসিমা। তাঁদেব চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। আমি কথা বলতে চেষ্টা করি। গলা শুকিয়ে যায়। মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমার চোখের পাতা ভারি ভারি বোধ হয়। চোখ বুজি। 'অত আপ্‌সেট হবেন না।' কার যেন টুকরো কথা কানে আসে।

'কেমন আছেন?' অচেনা গলা। আমার বিছানার পাশে এক ভদ্রলোক। মোটা মাঝ-বয়সী। একমুখ গোঁফদাড়ি। পোশাকে ট্রাম-কোম্পানির কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী বলেই মনে হল। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। নার্স ইশারায় তাঁকে কথা বলতে বারণ করলেন। 'সরি।' তিনি ঢেউ-খেলানো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে চলে গেলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

মেডিকেল কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি। তাছাড়া ছিল মেসোমশাই-এর ব্যক্তিগত প্রভাব। ডাক্তার-নার্সের সেবাযত্নে আমার অবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। মাথার চোট তত গুরুতর না হলেও বাঁ হাতটা জখম হয়েছিল মারাত্মকভাবে।

রোজ বিকেলে বাবা-মা-কাকু তো আমাকে দেখতে আসতেনই। তাছাড়া আসত সেতু। প্রায়ই মাসিমা। প্রতিদিন দেখতুম কেমন-যেন একপ্রকার বিষণ্ণতা সেতুকে ঘিরে আছে। একদিন জিগোস করি, 'আচ্ছা, মেসোমশাই আছেন কেমন? তাঁকে তো দেখি না।'

'এখন ভাল। আসবেন।'

'শরীর কী খারাপ?'

'তেমন কিছু না। রক্ত দিয়ে একটু যা দুর্বল হয়ে পড়েছেন।' সেতু জানায়।

'রক্ত! আমাকে?' আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি।

'ও কিছু না।' সেতু শুষ্ক হাসে।

আমি সেতুর একটা হাত টেনে ধরলুম। 'বলো—। না বললে কিন্তু ছাড়বো না।'

'বলছি, বলছি। ছাড়ো। কেউ দেখে ফেলবে।' সেতু বলে, 'তোমার রক্ত 'এ' গ্রুপের। আমার ও বাবার রক্তও তাই। ব্লাড ব্যাঙ্কে তখন 'এ' গ্রুপ রক্তের আকাল। প্রথমে আমিই এগিয়ে এলুম রক্ত দিতে। কিন্তু হালে ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলে আমি বাতিল হয়ে যাই। অগত্যা বাবাকেই—'

শুনে, আমার চোখে জল আসে।

'কেন? তোমার কোন আপত্তি ছিল?'

'ছি। ঋণের বোঝা আরো ভারি হল এই আর কী। আচ্ছা, বাবা-মা-কাকু তো ছিলেন।'

'ছাড়ো তো ওসব কথা। কেন? আমরা কী তোমার পর?' অভিমানের সুরে বেজে ওঠে সেতু।

চুপ করে যাই।

পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগে প্রায় একমাস। তারপর বাড়ি ফিরি। বাড়িতেও বেশ কিছুদিন বিশ্রাম।

এক অপরাহ্ণে বিনা নোটিশে হাজির হলুম সেতুর বাড়ি। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছি, মেসোমশাই-এর কাশির আওয়াজ শুনে আমি সতর্ক হয়ে গেলুম। সিঁড়ির পাশে একতলায় তাঁর চেম্বার। সে সময় সেখানে তাঁর থাকার কথা নয়। আমি আশ্চর্য হলুম। গেলুম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। 'এসো, বসো। এখন শরীর কেমন?'

'ভালই। আপনার শরীব?'

'ফাইন।'

এমন সময় শুনি চটিব শব্দ। ডাক্তার-কাকা। আমাকে দেখে তিনি যেন একটু অপ্রতিভ হলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'যাক, দেখা হয়ে ভালই হল। এখন কেমন?'

'ভাল। আপনি?'

'বেশ আছি। এ বয়সে যেমন থাকা যায়। তোমার বাবা-মায়ের খবর সব ভাল তো?'

'ভালই আছেন। আমাদের বাড়ি যাবেন না?'

'তোমাব সঙ্গে দেখা না-হলে যেতুম। একদিন যাব'খন। খবরাখবর সবই তোমার কাকুর কাছে পাই।' তিনি আমার পাশে চেয়ারে বসলেন।

ততক্ষণ মেসোমশাই আমাদের কথা শুনছিলেন। 'অরবিন্দ আমার সতীর্থ। একই হস্টেলে থেকে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করি। মাঝে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না। যাও, ওপরে যাও। ওরা সব ওপরে।'

দোতালায় উঠতে না-উঠতেই মাসিমাব সঙ্গে দেখা। তাঁব মুখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। কুশল প্রশ্ন বিনিময়েব পর তিনি বলেন, 'ঈশ্বব তোমায় রক্ষে করেছেন, বাবা। সেতু, ওর ঘরে। যাও বসো :গে।'

সেতুকে চমকে দিতে খুব সন্তর্পণে আমি তার ঘরে ঢুকি। সে তখন আয়নার সামনে বসে। প্রসাধনে ব্যস্ত। তার চিকন কালো চুলে নিপুণ খোঁপা। পাতলা ঠোঁট করমচার মতো লাল। ফরশা মুখে পদ্মের শোভা। উচ্ছ্বসিত যৌবন যেন বক্ষো-আবরণীতে আটকাচ্ছে না। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। আমার উপস্থিতি সে টের পায়নি। মনে হল এভাবে তার রূপ-মাধুরী পান করা ঠিক হচ্ছে না। এগিয়ে গেলুম। আয়নার মধ্যে ফুটে উঠি। পোশাক ঠিক করতে করতে সে উঠে দাঁড়ায়। তার বুক ও নিতম্ব

তাতে আরো স্পষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। বলে, 'জানি, তুমি আসবে।'

'মনোপ্যাথি?' ঈষৎ ব্যঙ্গে বলি।

'ঠিক তাই।' সে বলে।

অতঃপর আমরা দু'জনে সোফার উপর বসি। গল্পের মধ্যে খানিক সময়। তখন একটা কথাই আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে, 'লগ্নভ্রষ্ট'। সে ব্যাপারে সেতুর অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমি অতিশয় বিস্মিত হলুম। আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে জলতে থাকে। অথচ কোন কথা জিগোস করতে পারছিলুম না। জিব যেন আড়ষ্ট। আমার মনের মধ্যে চাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। হঠাৎ বলে ফেলি, 'লগ্ন পেরিয়ে গেল যে—।'

এক লহমায় সেতুর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। আলো যেন দপ করে নিবে গেল। আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়।

সেতু নিজে সহজ হবার চেষ্টা করে। নড়ে চড়ে বসে। মুখে হাসি ফোটায়। মনে হল, হাসিতে কৃত্রিমতার ছাপ। টেনে টেনে বলে, 'আশায় আশায় দিন গোনা ভাল। এতে আলাদা আনন্দ আছে। তাই না?'

আমি উত্তর দিই না ব্যাপারখানা সে যে এড়িয়ে যেতে চায়— বুঝতে বিলম্ব হয় না কিন্তু কেন? এমন সময় মাসিমা এলেন। যথারীতি চা ও খাবার।

সেদিন আতিথ্যে একটু পার্থক্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বোধ হল। মাসিমা আমার সামনে চেয়ারে বসলেন। আমি খাচ্ছি আর তাঁর সাথে গল্প করছি। তাঁর সারা মুখে নির্মল হাসি। মা সন্তানকে পরিবেশন করে যেরকম তৃপ্তি পান, সেরকম পরিতৃপ্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখমণ্ডলে। অভিভূত হয়ে পড়ি। তিনি কত-না কথা বলছেন আর আমি শুনছি। এক সময় সেতুকে দেখে নিলুম। সে নির্বাক বসে আছে। অন্যমনস্ক বলেই মনে হল। মাসিমা উঠলেন। 'তোমরা গপ্প করো।' চলে গেলেন?

সেতু তখনো বসেছিল নিশ্চুপ। বুঝি, রহস্যের ঘেরাটোপে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়। আর আমি তার আড়াল ভাঙতে চাই। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। সে কী আমার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে? নাকি, অন্যায় কোনো আচরণ করেছি আমি? সংশয়াকুল চিত্তে তার দিকে তাকালুম। বলি, 'তোমার শরীর কী খারাপ?'

'না তো।' সেতু সোজা হয়ে বসে।

'তবে?'

'এমনি।'

ভাঙা গেল না ওর কঠিন আবরণ। চেম্বারের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমাকে উঠতে হল। নিরুত্তাপ বিদায় জানাল সেতু।

॥ নয় ॥

এক সকালে। পড়ার ঘরে বসে একমনে একটা মেডিকেল জার্নেলের পাতা উলটাচ্ছি। সহসা সেতুর আবির্ভাব। তার পোশাক রীতিমত উজ্জ্বল। ঝলমল শুধু পোশাকই নয়, শরীরও। মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। সে একটা সোনালি রঙের খাম বাড়িয়ে দেয়। 'কাল আমার জন্মদিন। সন্ধ্যায় বার্থ-ডে পার্টি। তোমার নেমন্তন্ন। যাওয়া চাই।' যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল।

পরের দিন যথারীতি উপস্থিত হলুম সেতুদের বাড়ি। উপহার স্বরূপ নিয়ে গেলুম একটা পছন্দসই টাঙ্গাইল শাড়ি। অবাক কাণ্ড। রুচিসম্মত বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির সামনে সারবন্দী দাঁড়ানো দেশী-বিদেশী নানা মডেলের মোটর গাড়ি। সারা বাড়ি জুড়ে আলোর ঝর্ণাধারা। প্রচুর লোক। এলাহি ব্যাপার। আমি ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকি।

সিঁড়িতে সবে পা রেখেছি, কানে এলো রবীন্দ্র-সংগীতের সুর ও বাণী। ইনার সেটিং বক্সে লো ভয়েস। কয়েক ধাপ উঠেছি, দেখা হল ডাক্তার-কাকার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'তোমার কথাই ভাবছিলুম। যাক দেখা হয়ে গেল। ওপরে যাও।' তিনি নেমে গেলেন।

সিঁড়ির গায়ে, ঘরের মধ্যে, সংগীতের মজলিশ। আসরখানা হোমোসাপিয়েনে ভরা। মহিলা-শ্রোতার সংখ্যাই বেশী। যেন রূপের হাট বসেছে। আমার দৃষ্টি গায়কের ওপর পড়তেই বিস্ময়ের চমক। প্রেমাঙ্কুরদা। আমার চেয়ে বছর-তিনেকের বড়। মেডিকেল-কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। মেধাবী। সবে বিলাত থেকে ফিরেছেন ডবল এফ্ আর-সি. এস্ হয়ে। ছাত্র হিসেবে দুর্ধর্ষ। তাঁর পাশে-বসা সেতু। আমি সেতুকে দেখতে থাকি।

সে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে বেশ খুশির মেজাজে। তার মিনে-করা সোনার দুলের দুলুনি, মোরগ-ঝুঁটি কেশরাশি, মসৃণ গ্রীবাদেশ আর পদ্মকোরকের মত উন্নত ও দৃঢ় বক্ষ তাকে নিরুপমা করে তুলেছে। অপ্রতিরোধ্য প্রবল আকর্ষণে আমার দৃষ্টি বার বার সেদিকে পড়ছে।

সহসা গানের পরই নাচ। দেখি, এক ষোড়শী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে নাচের ভঙ্গিমায়।

নাচ শেষ হতেই আমার দৃষ্টি পড়ে সেতুর ওপর। চোখে চোখ পড়তেই ধাক্কা খেলুম। সে চোখ সরিয়ে নেয়। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে আমি বিস্ময়ে আকুল হই। বিষাদে বিবশ। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো না কেন? সেতু তো আমার গান শুনে কত-না প্রশংসা করেছে। সে কী ভুলে গেছে? আর প্রেমাঙ্কুরদা? তিনি তো রক-সংগীত গায়ক। রবীন্দ্র সংগীতের 'র' জানেন কিনা সন্দেহ। অথচ তাঁকেই গাইতে বলা। আশ্চর্য! প্রেমাঙ্কুরদার পাশে সেতুকে দেখে আমার বুক টনটন করে ওঠে। আমি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ি।

রাত গড়িয়ে যায়। আসর ভাঙে। সেতু এগিয়ে আসে লঘু পদক্ষেপে। আসেন প্রেমাঙ্কুরদাও। মেয়েদের মতন তাঁর ঘাড়ভর্তি চুলের বাহার। পরনে যদিও ধুতি-পাঞ্জাবি, সামলাতে পারছেন না। সেতু বলে, 'পরিচয় করিয়ে দিই।'

'আমরা আগে থেকেই পরিচিত।' আমি প্রেমাঙ্কুদার সাথে করমর্দন করি।

এবার খানাপিনার পালা। মেসোমশাই নিজেই পরিবেশনের-তদারকি করতে থাকেন। আমার কাছে আসেন। শান্ত কণ্ঠে বলেন, 'লজ্জা করো না। যা দরকার চেয়ে নিও।' ব্যস সেই পর্যন্ত। দেখি, প্রেমাঙ্কুরদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাতে 'এটা দাও, ওটা দাও' বলে পরিবেশকদের বারে বারে তাগিদ দেন। প্রেমাঙ্কুরদার আপ্যায়নে আতিশয্যের ভাব আমার দৃষ্টি এড়ায় না। সেদিনের অনুষ্ঠানে যেন তিনিই ভি. আই. পি.। কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ যে হই না তা নয়। ব্যাপার কি? অতৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। এমন সময় ডাক্তার-কাকা উপস্থিত হলেন।

'কী হলো? খাচ্ছ না যে?'

আমি সহজভাবে বলি, 'আমি স্বল্পাহারী।'

ডাক্তার-কাকা বলেন, 'তোমাদের মতন বয়সে কত-না খেতে পারতুম। নেমন্তন্ন-বাড়িতে আমার খাওয়া নিয়ে হৈ চৈ বেঁধে যেত। আমাকে 'মধ্যম পাণ্ডব, বলে লোকে ঠাট্টা করত।' আবার বলেন, 'তবে কি জানো বাবা, নেহাৎ হৃদ্‌রোগটা ঝামেলা না পাকালে ওসব প্রেসার-ট্রেসারকে থোড়াই কেয়ার করতুম। খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দিতুম।' আমার পাশে-বসা কয়েকজন ভদ্রলোক ডাক্তার-কাকার কথাগুলো শুনছিলেন। একজন বলেন, 'এই বয়সে দেখছি—আপনার পেশীগুলো যা—। একেবারে তারুণ্যের জোয়ার।'

ডাক্তার-কাকা আক্ষেপ করে বলেন, 'এখন আর কী দেখছেন? ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। তখনকার মতন আর শরীর-চর্চা করতে পারি না—।'

আমি মনে মনে বলি, 'নিজের দোষ। প্যাকেট প্যাকেট সিগ্রেট উড়িয়েছেন। তার সঙ্গে বোতলও চলত, শুনেছি।'

ভোজন-পর্ব শেষ হল। আমি নিচে নেমে আসি। আমার পিছু পিছু ডাক্তার-কাকাও। তিনি নিচু স্বরে বলেন, 'বাবা, একটা কথা ছিল।'

আমি ঘুরে দাঁড়াই। 'বলুন?'

ডাক্তার-কাকা হাসিমুখে বলেন, 'সেতুর জন্মদিনে যেমন এসেছো, কাল বাদ পরশু, কল্পনার জন্মদিনে তেমনি যাওয়া চাই। বাড়ি না গিয়ে, এখানে মুখে নেমন্তন্ন করলুম বলে কিছু মনে কোরো না বাবা।'

আমি সামান্য ইতস্ততঃ করে বলি, 'সামনে এম্‌ ডি. পরীক্ষা যে—।'

ডাক্তার-কাকা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'বাবা, পাশ তো করবেই। বেশী না পড়লেও তোমার পাশ ঠেকায় কে? তাছাড়া তোমার কাকুও যেতে বলেছেন। ক'দিন ধরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না।'

দুর্বল জায়গায় ঘা পড়ল। আমি আর না করতে পারলুম না। তাছাড়া জন্মভূমির দুর্বার আকর্ষণ। ভরতপুরের শ্যামল বরণ ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এক শ্যামলী সাহসী মেয়েও। কল্পনা নড়াচড়া করে স্মৃতির মধ্যে।

॥ দশ ॥

বেলা বারোটা। ভরতপুর। কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। ভারি আশ্চর্য লাগে। মাঝে একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।

তবু আগের সেই পুরানো চেহারা নিয়ে গ্রামখানা দাঁড়িয়ে আছে। বদলায়নি। পরিবর্তনের মধ্যে যা এসেছে, বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা দেখে অন্ততঃ তাই মালুম হয়। তবে কী পরিকল্পনাগুলো শাসকশ্রেণীর হাতে তরুণের তাস? যা হোক, মন্দের ভাল। আমি এগিয়ে চলি। দেখি, একটা হাড় জিরজিরে রোঁয়া-ওঠা কুকুর আকাশ পানে মুখ তুলে কাঁদছে—ভৌ ভৌ। আমি থমকে দাঁড়াই। সামান্য ভীতি। মনে পড়ে সেই দংশক সারমেয়ের কথা। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আমি ফের হাঁটতে থাকি। চারদিকে ছড়ানো সবুজের সৌন্দর্য। ফেলে-যাওয়া গ্রামের কত কথাই-না মনের কোণে ভিড় জমায়। বাল্যের স্নিগ্ধ স্মৃতি-জড়ানো তরুলতা, বাঁশের ঘন বন, ছায়া ঢাকা বড়পুকুর।

দেখতে পাই আকাশের ধূসরিমা ঠেলে কয়েকটা শকুন পাক খাচ্ছে। ঠিক আমার মাথার সোজাসুজি। অশুভ লক্ষণ কী? কাকুর কথা মনে পড়ে তৎক্ষণাৎ। বিপদের আশংকা করি। কুকুরের কান্না, শকুনের ডানা—এসব কী? অবাঞ্ছিত কোন ঘটনার ইঙ্গিতবহ না কি? বিচলিত হয়ে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সংযত হই। কুসংস্কার। কুসংস্কারই তো। কুসংস্কারের রাহুগ্রাস থেকে এদেশ কী মুক্ত হতে পেরেছে? পারেনি। যদি পারত তাহলে সতীদাহ, নরবলির মত জঘন্য প্রথাগুলো চালু আছে কেন?

বাড়ির সামনে বট গাছটি দেখে আমি বিস্মিত। ইস্ কত ছোট্ট দেখে গিয়েছিলুম। ইদানিং তার বাড-বাড়ন্ত সত্যই দেখার মত। চারপাশে ডালপালা ছড়িয়ে সে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এ-রকম একটা আগ্রাসী বৃক্ষকে প্রশ্রয় দেবার অর্থ কী? ডালে ডালে কাক-শালিকের পুরীষে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না কী? কে জানে, ডাক্তার-কাকা আবার উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন।

আমায় দেখে একটা অল্প বয়সী ছেলে দৌড়ে অন্দর মহলে ঢুকে যায়। ডাক্তার-কাকা দ্রুত বেরিয়ে এলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জমে ওঠে ছোট বড় ছেলে-মেয়ে-বউদের একটা পাঁচ-মিশেলি ভিড়।

আমি ভেতরে ঢুকি। চেয়ার ছিল, বসি। ঘরখানা বেশ সাজানো-গোছান। মৃদু গন্ধ পাচ্ছিলাম। কাকিমার রুচি আছে বলতে হবে। কল্পনা সিলিং ফ্যান চালু করে। জয়কালো শাড়ি পরেছে। মুখে-চোখে হাসি ঠিকরে পড়ছে। কাকিমার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শাড়িটা তাঁর হাতে তুলে দিলুম।

খেতে বসি। 'ওকে চিনতে পারো?'

তাকাই। এই ছেলেটাই কিছুক্ষণ আগে আমাকে দেখে অন্দর মহলের দিকে দৌড়েছিল। রোগা। অপুষ্ট। বয়স বারো কি তেরো। চিনতে পারলুম না। সে লজ্জায় কিংবা ভয়ে কুঁকড়ে আছে। 'ঠিক চিনতে পারছি না।'

'পারবে কি করে? আগে তো দেখেছ।' ডাক্তার-কাকা বলেন, 'জিতেন মানে জামাইয়ের ছেলে। ভাল ছেলে। ফাই-ফরমাস খাটছে।'

ধড়াস করে ওঠে বুকের ভেতরটা। জাঁদরেল জামাই যেন মুহূর্তে হাজির জল্লাদের ভঙ্গিমায়। অতীতের দিনগুলো আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। শয়তান। সে-হেন লোকের সঙ্গে ডাক্তার-কাকার কিসের আঁতাত? তবে কি এক পালকের পাখি? বিচলিত হলুম। হাত কেঁপে ওঠে। সন্দেশ খসে পড়ে। আমি নড়ে বসি।

মনে হয় ডাক্তার-কাকা আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি গম্ভীর মুখে আমার পানে তাকালেন। বললেন, 'মানুষ কী চিরকাল একই রকম থাকে? বদলে যায়। জানি, তুমি তাকে পছন্দ করো না। আজ সে অনুতপ্ত। তার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়. কঠিন অসুখে ভুগছে। শয্যাশায়ী। বাঁচবে না।' ডাক্তার-কাকা শ্বাস ছাড়েন। 'তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে। যেও।'

সন্ধে হতে-না-হতেই বাড়ির চেহারা বদলে যায়। আলোর রোশ-নাইয়ে সারা বাড়ি ঝিলমিল করতে থাকে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। কাকু এলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে। বেশ কাহিল মনে হলো। কুশল প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'পায়ে গেঁটে-বাত। বড্ড কষ্ট দিচ্ছে।' দেখেই বুঝতে পারলুম আরথ্রাইটিস। চিকিৎসাব কথা জিগ্যেস করায় বললেন, 'হোমিওপ্যাথি খাচ্ছি।'

শুনে, একটু বিরক্ত হলুম। 'ওতে কী সারবে?'

'তোমাদের এলোপ্যাথিতে অব্যর্থ কোন দাওয়াই আছে না কী?'

কাকুর প্রশ্ন শুনে ডাক্তার-কাকা তো হেসে গড়িয়ে গেলেন। আমি চুপ করে গেলুম।

উঠোনে খাবার জায়গা। মস্ত উঠোন। মাথার ওপরে শামিয়ানা টাঙানো। টেবিল পাতা। রঙীন টেবিল-কভার। ফোল্‌ডিং চেয়ার। অতিথিদের মধ্যে চেয়ার দখলের ধুম পড়ে যায়। আমি ধরে না ফেললে এক স্থূলকায়া মহিলা তো কাকুর ঘাড়ের ওপর নির্ঘাৎ পড়ে যেতেন। আমি

কাকুর পাশে বসি। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ-জলের স্প্রে। একটা করে জলের বোতল আর চীনামাটির প্লেট। বোতলে ঠাণ্ডা কোকাকোলা। জনা-পাঁচেক যুবক পরিবেশন করতে থাকে। গায়ে তাদের সাদা অ্যাপ্রন। দু হাতে সাদা গ্লাভস। অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিবেশন। পাড়াগাঁয়ে এ রকম ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার চোখ কপালে। আরো অবাক হলুম অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার প্রাচুর্য দেখে। পরিবেশকদের মুখে হাসিটি লেগে আছে। চারদিকে যেন একটা প্রাণময় পরিবেশ। তবে আমাব প্রতি যত্ন-আত্তিব আধিক্য লক্ষ্য করি। ডাক্তার-কাকা ও কাকিমা আমার কাছে এসে ঘুরে গেলেন বেশ কয়েকবার। প্রতিবারই প্রশ্ন, অসুবিধা হচ্ছে না তো। কল্পনাও আসে। তখন রসগোল্লার পরিবেশন হচ্ছিল। 'কেমন হয়েছে? ঘরে তৈরী।'

বলি, 'অপূব।'

কল্পনা তখন এক পবিবেশককে কী যেন ইঙ্গিত করে। অমনি আমার পাতে বসগোল্লাব পাহাড জমে ওঠে। প্রতিরোধ বার্থ হয়। 'অপূব' বলার এই পবিণাম। কল্পনার পানে চকিতে দৃষ্টিপাত করি। সে মুচকি মুচকি হাসছে। সেজেছে বটে। রূপ যেন ঠিকবে পডছে। সেতুর জন্মোৎসবের কথা মনে পড়ে।

ভোজন-পর্ব শেষ হতে হতে বাত দশটা। আমি ছাদে উঠে গেলুম। ধূমপান না হলে এত খাওয়া হজম হবে না। পকেট হাতড়াতে থাকি। প্যাকেট পাই না। ভুলে গেছি না কি? তখন ধূমপানের নেশা আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

পদশব্দে পিছন ফিরে তাকাই। কল্পনা। আশ্চর্য। তার হাতে আনকোরা সিগারেটের প্যাকেট। আমি প্রায় ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিলুম।

'আবে ব্বাস তব সইছে না। আপনার জন্যেই তো এনেছি।'

উত্তব না দিয়ে জোরে-জোরে সিগারেট টানতে থাকি।

'টানছেন, টানুন। পরে বুঝবেন। ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'কল্পনা দেবী, 'ভুলে যেও না আমি ডাক্তার।'

'ভালো সাঁতারুরাই জলে ডুবে মরে।'

'জ্ঞান দিচ্ছো?'

'আছা। এতে জ্ঞান দেবার কি হল? জানেন না যেন। জেনেশুনে বিষপান।'

'বিষপান? সে তো কবিগুরু বলেই গেছেন।'

'আজ্ঞে, সে সিগারেটের বিষপান সম্পর্কে নয়।'

'তবে?' আমার চোখে কৌতুক খেলে যায়।

'জানি না।' কল্পনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি বলব?' হাসতে থাকি।

'থাক্ খুব হয়েছে।' সে বিব্রত হয়।

'বলই না শুনি। ফুসফুস ছাড়া আর কি ক্ষতি হয়।'

আলাপ দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা আর কি। এখন রাত নিঝুম। আকাশে মেদুর জোছনা বাতাসও মন্দ-মধুর। একা কল্পনা।

'ব্রংকাইটিস হতে পারে, ক্যানসার।' কল্পনা বলে, 'হার্ট দুর্বল হয়ে যায়।'

'আরে এতসব জানলে কি করে?' আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত।

কল্পনা চোখের তারায় ঘূর্ণি আনে। 'আমার বাবা ডাক্তার, না?'

সে একটু অন্যমনস্ক হয়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলি, 'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? চাঁদে যাবে?'

'ওখানে কী মানুষ আছে?' সে আচ্ছন্ন স্বরেই বলে। বুঝতে পারি পরিবেশ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

বলি, 'তোমার মতো এ-প্রশ্ন অনেকেরই। তার আগে জানা দরকার পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হলো কী করে? তুমি জানো নিশ্চই। বলব?'

'বলুন।'

'গুরুগম্ভীর হয়ে যাবে। তবু যখন জানতে চাইছো, বলি।' আমি বলতে থাকি 'প্রাণের একটা উপাদান হল অ্যামাইনো অ্যাসিড। তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে দরকার উপযুক্ত তাপ আর অক্সিজেন। তাছাড়া চাই কার্বন। সূর্য থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে পৃথিবী। তাপ ও অক্সিজেনযুক্ত উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে এখানে। সৃষ্ট হয়েছে প্রাণ। তাহলে পৃথিবীর মতো পরিবেশ যে গ্রহে থাকবে, সেখানেই প্রাণের সম্ভাবনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, একশ' আলোকবর্ষের মধ্যে কমসে কম পঞ্চাশটিতে আছে উন্নত সভ্যতা।'

হঠাৎ পদশব্দ। কেউ ছাদে উঠে আসছে। কল্পনা আমার সান্নিধ্য থেকে সরে যায়।

'তোমরা এখানে।' কাকিমা। 'কখন থেকে খুঁজছি। রাত হয়েছে। যাও, শুয়ে পড়।'

কল্পনা চলে যায় ওর মায়ের সঙ্গে।

সকালে ডাক্তার কাকা এলেন। বললেন, 'আজকের দিনটা থেকে যাও। আবার কবে আসবে, ঠিক নেই। জামাইয়ের সাথে একবার দেখা করে এসো।'

উপরোধ এড়ানো গেল না। বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে কল্পনা। কাঁচা রাস্তা হলেও মোটামুটি মসৃণ। দুধারে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। দুজনে হাঁটতে থাকি। স্নিগ্ধ বাতাস লাগে গায়। শরীর বেশ হাল্‌কা বোধ হয়। মস্ত বড় এক আমগাছ নজরে পড়ে। সে আমার বাল্য-ইতিহাস। কৈশোরের কত না কথা মনে পড়ে। দুপুরে মা যখন বিশ্রাম নিতেন, ঠা ঠা রোদে চুপিসারে আমি বেরিয়ে পড়তুম। সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুরা। ঢিল মেরে কাঁচা আম পাড়তুম। তারপর ছায়ায় বসে নুন-লঙ্কা মিশিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া। মনে পড়ে। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিলুম। ত্যাগ করি।

'আরে করছেন কী?'

'আম পাড়ব।' আমি সহজভাবেই বলি।

কল্পনা কৌতুকে হেসে ওঠে। 'এখন কী আমের সময়?'

'তাই তো।' অপ্রতিভ ও লজ্জিত হই।

জামাইয়ের বাড়ি পৌঁছে গেলুম। বাড়ি বলতে মাত্র একখানা ঘর। ইটের গাঁথনি। চুন-বালির পলেস্তারা-খসা দেওয়াল। নোনায় ধরেছে। টিনের ছাউনি। তেচালা। ফালি বারান্দা। ছোট উঠোন। সেখানে একটা পাতকুয়া। পাশে এঁটো থালা-গ্লাস ছড়ানো। সব মিলিয়ে একটা নোংরা পরিবেশ।

ঘরের দরজাটা আবার বেজায় খাটো। মাথা নিচু করে ঢুকি। জামাইকে চেনাই যায় না। শরীর ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষটা শীর্ণ, নেতিয়ে পড়েছে। চুল উঠে গেছে, মাথা প্রায় ফাঁকা। কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি। পাকাই বেশি। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। দাঁত পড়েছে। গাল বাটি হয়ে গেছে। হাড়ের ওপর চামড়ার ঢাকনা। সে একটা ময়লা বালিশে ঠেশ দিয়ে বসেছিল। তার স্ত্রী দুটো নড়বড়ে টুল দিল।

'কী কষ্ট হচ্ছে?' আমি শুধাই।

'কষ্ট! কিছু না। এ আমার কর্মফল।'

হাতের কাছেই জলের গ্লাস ছিল। ওর স্ত্রী এগিয়ে দেয়।

জামাই বলে, 'বেয়াড়া বেমারি। লিভারে ক্যানসার। কুরে কুরে খাচ্ছে।' চুপ করে যায়। হাঁপাতে থাকে। সে জোড়হাতে আমার দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। 'বহু দোষ করেছি। ক্ষমা করো, বাবা।' সে হাঁপাতে থাকে আর বলে, 'পরের কথায় নেচেছি। এখন ভুলের মাশুল গুণতে হচ্ছে।' মুখে কষ্ট ফুটে ওঠে। মনে হয় তার লিভারে যন্ত্রণা হচ্ছে। সান্ত্বনা দেওয়া অর্থহীন। ভরসাই বা কী দেব? ইতিমধ্যে তিনি তো জেনে ফেলেছেন তার পরিণাম।

ফেরার পথে আমরা দ্রুত পা চালাই। আচমকা কয়েকটা শুওর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ছুটে আসে আমাদের দিকে। আমি ভয় পাই কল্পনার একটা হাত চেপে ধরি।

কল্পনা হেসে ওঠে। বলে, 'ওরা ভগবানের বরাহ অবতার।'

শুওরগুলো পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

কুকুরই বোধ হয়। দেখতে পেয়েছিলুম দূর থেকে। হেসে পড়ি।

'ভয় পেলেন নাকি?'

'তা একটু পেলুম বৈ কি। কথায় বলে ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।'

'অত ভয় পেলে চলে।' কল্পনা হাসছিল। 'এদেরও প্রয়োজন আছে। নইলে ঈশ্বর ওদের সৃষ্টি করবেন কেন?'

'ছাড়ো তো তোমার ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব। ওসব ক্রম-বিবর্তনের ফসল, বুঝলে?'

'ক্রম-বিবর্তন না-হয় মানলুম। তবে বিবর্তনের ধারায় ওরা মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে।'

'এগিয়ে!'

'হ্যাঁ। চমকে ওঠারই কথা। ওদের ঘ্রাণ-শক্তি আমাদের চেয়ে কত প্রবল তা তো আপনি জানেন। শ্রবণ-শক্তিও কম যায় না।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আমরা যে শব্দ আশি-নব্বই ফুট দূর থেকে শুনতে পাই না, কুকুর তা অনায়াসে পারে।'

কথা বলতে বলতে আমরা বাঁশ-ঝোপের কাছে এসে পড়ি। ঝোপের ভেতর দিয়ে আমাদের রাস্তা। সেখানে অন্ধকার গাঢ়তর। কিছুই ঠাওর হয় না। নুয়ে-পড়া বাঁশগুলো বাতাসে যেন গা-ছমছমানির বাজনা বাজায়। বাঁশ-ঝোপের বাজনার সঙ্গে চলছিল ঝিঁঝির সংগত। নৈশ আসরের এ এক আলাদা স্বাদ। তাল কাটে—খসখস শব্দে। পায়ের সঙ্গেই যেন জড়িয়ে গেছে।

'সাপ—সাপ—' আমি লাফিয়ে উঠি।

'না। সাপ না।' কল্পনা ছড়িয়ে দিল হাল্‌কা হাসির হিল্লোল। 'কঞ্চি। এই দেখুন।'

আমি পরখ করে দেখলুম। হাঁা, কঞ্চিই বটে। লজ্জিত হলুম।

'ভীতু। আপনি একটি ভীতু-মহারাজ।' অসংকোচে আমার একটা হাত ধরে কল্পনা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কী ডাকছে বলো তো?' একসঙ্গে এগোই খানিকটা।

'ঝিঁঝি পোকা।' কল্পনা বলে, 'আপনার সবেতেই ভয়। জানেন, ঝিঁঝি আমাদের কত উপকার করে?'

'ঝিঁঝি উপকার করে?' আমি হেসে ফেলি।

'ঠাট্টা করছেন? দেখবেন ঝিঁঝির কামড়ে আপনার হাতের আঁচিলটা সারিয়ে দিতে পারি?'

'পারো?' তখনও অবিশ্বাস।

'আচ্ছা দেখুন। গোটা কতক ঝিঁঝি ধরি—'

'থাক থাক। অন্যদিন ধরো।'

'অন্যদিন কেন? আজই পরখ হয়ে যাক।'

'আজ তাড়া আছে।'

হাঁটতে থাকি।

'জানেন, বাবা আরও কী বলেছেন?'

'কী?'

'মৌমাছির কামড়ে সেরে যায় বাত আর পেশীর যন্ত্রণা।' কল্পনা বলতে থাকে 'ক'মে যায় রক্তের চাপ আর কোলেস্টেরলের মাত্রা।'

'তাই না কি। হুলের বিষে এত ক্ষমতা!'

তবে আর বলছি কী? এইসব বিষে আছে উপকারী রাসায়নিক পদার্থ।'

'লোকে জানতে পারলে বহু ওষুধ-কোম্পানীর গণেশ উল্টাবে।'

'ফের ঠাট্টা!' কল্পনা আমার হাতে মোচড় দেয়। যেন শাস্তি।

কোমল হাতের মোচড়! ভালই লাগে।

কল্পনা বুঝতে পারে। হাত ছেড়ে দেয়।

বাড়ি ফিরে দেখি, কাকিমা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। গরম কচুরি আর চা পরিবেশন করেন। চা খেয়ে কল্পনা চলে যায় নিজের ঘরে। আমিও উঠছিলাম, কাকিমা শান্ত স্বরে বলেন, 'একটা কথা ছিল, বাবা।'

'বলুন।'

'বলছিলুম কী—' কাকিমা দ্বিধা কাটাতে সময় নিলেন। 'কল্পনা আমাদের একমাত্র সন্তান, তুমি তো জানো। এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস। আর আমরা ক'টা দিনই-বা বাঁচবো। তোমার কাকার তো হাই প্রেসার, ডায়বেটিস। আমাদের অবর্তমানে কল্পনাকে দেখবে কে? সে-ভার তোমাকেই নিতে হবে, বাবা।'

আমি বিমূঢ়। কথাই বলতে পারি না।

কাকিমা বলতে থাকেন, 'প্রত্যাখ্যান করলে মর্মাহত হব। আমাদের যাবতীয় বিষয়-আশয় তো তোমাদেরই হবে।' কাকিমার চোখ ছলছল করতে থাকে।

কোনো মতে বলি, 'বাবা-মা-কাকু রয়েছেন। তাঁদের অনুমতি তো দরকার।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।' কাকিমা বলেন, তোমার কাকুর সায় আছে। আশা করি তোমার বাবা-মা সম্মতি দেবেন।'

'আমার এম. ডি. পরীক্ষাটা হয়ে যাক-না।'

'বেশ তো ততদিন অপেক্ষা করব।'

আহারাদির পর নরম বিছানার মধ্যে ডুবে যাই। ঘরে তখন নৈশ বাতির সবুজ আলো। ঘুম আসছে না। ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে হবে। সেতু আমার ধ্যান-জ্ঞান। আমার বাসনা, আমার স্বপ্ন। তাছাড়া বিয়ের কথাও পাকা। এ-রকম অবস্থায়? জটিল। বড়ই জটিল।

তক্ষুণি কল্পনা এঘরে আসছিল ঢাকা-দেওয়া এক গ্লাস জল নিয়ে। রাত্রে আমার তৃষ্ণা পেতে পারে এই ভেবে। তার হাত থেকে গ্লাস পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল, ভাঙা কাচের গ্লাসের ওপর। 'সাপ! সাপ!'

আচম্বিতে চিৎকার করে ওঠে কল্পনা। খাট থেকে নেমে পড়ি। দেখি, মেঝের ওপর একটা বিষধর। উদ্যত ফণা।

'শিগগির বেরিয়ে আসুন ঘর থেকে।'

সাহসী কল্পনা পর্যন্ত ভীত, বিপর্যস্ত।

কল্পনাও বেরিয়ে এল। দৌড়। দৌড়। আমার একটা পা হঠাৎ পিছলে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর কি। আমায় জাপটে ধরে কল্পনা। তখন দেখি, সেই শৌণ্ড দানব তেড়ে আসছে অমিত বিক্রমে। আমরা দু'জনে দৌড়তে থাকি উদলা পদে, উন্মাদ বেগে। ক্রুর সর্পের ক্রুদ্ধ গর্জন সাইরেন-ধ্বনির মতো আমার কানের পর্দা কাঁপিয়ে তোলে। অজানা-অচেনা রাস্তা। কোথাও এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও-বা মসৃণ। কোথাও সরু, কোথাও-বা চওড়া। কোথাও খাড়া, কোথাও-বা গড়ানে। আমরা ছুটছি প্রাণ বাঁচাতে—টলতে টলতে, টক্কর খেতে খেতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কখনো-বা হামাগুড়ি দিতে দিতে। কেবলই ছুটছি। ভূমিকম্পের সময় ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষ যেমন ছোটে, তেমনি। কল্পনা আগে আর আমি তার পিছে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেদ করে শুনতে পাই হিসহিস শব্দ। ভয়াল ভুজঙ্গ ছুটে আসছে। দাঁড়ালেই মৃত্যু। ক্লান্তি। আমি ভেঙে পড়ি। আবার দৌড়। গতি মন্দীভূত হয়। কল্পনা ঘুরে দাঁড়ায়। টান দেয় আমার হাত ধরে। অবসন্ন। এবার আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি নেই। হঠাৎ সামনে একটা পাহাড়। পথ অসমতল। তবু লক্ষ্য ওই পাহাড়। তখন ভুজঙ্গের গতি মন্থর হতে বাধ্য।

শুষ্ক পার্বত্য পথ ভাঙতে থাকি। সংকীর্ণ ও রুক্ষ পথ। পাশে গভীর খাদ। একটু এদিক-ওদিক হলে পতন অনিবার্য। ক্রমশঃ আমরা এমন স্থানে উপস্থিত হলুম যেখানে পথের শেষ। সম্মুখে সুউচ্চ বিশাল পর্বত। তাকে অতিক্রম করা দুষ্কর। 'কাঁধে করে আমাকে একটু তুলে দিন।' কল্পনা বলে, 'আমি উঠব।'

তার হাল্কা দেহ তুলে দিতে আমার কোন কষ্ট হয় না। সে ওপরে উঠে গেল। এবার আমার পালা। কার কাঁধে ভর করব? কে আমায় তুলে দেবে? উৎকণ্ঠা বোধ করি। শাড়ি। কল্পনা শাড়ি খুলে ফেলেছে। শুধু অন্তর্বাস। শাড়িটা দড়ির মত পাকিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দেয়। সে আস্তে আস্তে টানতে থাকে। আমি পাথরের ঘষা খেতে খেতে উপরে উঠি।

দুর্গম যাত্রা। চড়াই উতরাই ভেঙে আমরা চলেছি। একটা নির্ঝরের

দেখা পাই। পিপাসা নিবৃত্ত করি। আবার শুরু হয় আমাদের যাত্রা। ক্রমে আমরা উচ্চতম শিখরে আরোহণ করি। প্রকৃতির অপূর্ব শোভা। অলৌকিক শান্তি। বিস্ময়ে বিমূঢ়। হঠাৎ আমার মনে পড়ে। সাপটা?

'ভয় এখনও আপনার কাটেনি?' কল্পনা যেন বিরক্ত। 'আশ্চর্য।'

'না করে—' আমি থতমত খেয়ে যাই।

'মর্তের সাপ এত উঁচুতে উঠতে পারে না।'

'মর্ত থেকে তাহলে আমরা কত উঁচুতে?'

'জানি না।'

সহসা কুয়াশা আমাদের ঘিরে ধরে। ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চারদিক। কল্পনা বলে, 'মেঘ। আমরা মেঘের রাজ্য পার হয়ে যাচ্ছি।'

'ভীষণ খিদে।' বলতেই হল। বাস্তবিক ভীষণ খিদে পেয়েছে।

'জানতুম।' সে একটা ফল বাড়িয়ে দেয়। 'খেয়ে ফেল।'

ফলটা খেতেই ক্ষুধা দূর হয়ে গেল। অবাক হলুম।

'কী ফল?'

'অমৃত।' তারপরই কৌতুকে জিগ্যেস করে, 'কোথায় এসেছি বলুন তো?'

তাকিয়ে দেখি, নভোমণ্ডলের গায়ে বিপুল নীলিমা আর নিচে ভরন্ত সবুজের সুষমা। অজস্র ফুল ফুটে আছে। ওগুলো পারিজাত কি? রঙের কী ঔজ্জ্বল্য।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আন্দাজ করুন।' কল্পনা হাসছিল।

'তোমার নামের মতই কল্পনা ছড়িয়ে দিতে হয়।' আমিও হাসি। 'কল্পরাজ্য।'

'এ হল স্বর্গোদ্যান।'

'তা-ই মনে হয় বটে।' বলি, 'চলো। এসেছি যখন, ঘুরে ফিরে দেখে নিই।'

এক জোড়া তরুণ-তরুণী। সোনার বরণ রূপ। স্ফটিক স্বচ্ছ পোশাক। কুসুমের আভরণ। তরুণীর চুলে সুগন্ধ। সীমন্তে কদম ফুল। কানে পারিজাতের ঝুমকো। গলায় গন্ধরাজের মালা। তার শিশির-ভেজা মুখ। তরুণী তরুণের বাহুপাশে পিষ্ট। সম্মোহিত দুজনে।

'হ্যাংলার মত ওভাবে তাকাতে হবে না।' কল্পনা বলে, 'খুব হয়েছে। চলুন—'

সমগ্র উদ্যানে ছড়িয়ে রয়েছে অনন্ত সৌন্দর্য, অফুরন্ত আনন্দ। আমাদের দেখা আর ফুরোয় না। সহসা কল্পনা ঘুরে দাঁড়ায়।

'এবার একটু বসা যাক।'

চারদিকে সুগন্ধ, সুবাতাস। মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশ। বিহ্বলতা জাগে। নিজেদেরও হঠাৎ মনে হয় দেবতনয় দেবতনয়া। বক্ষে ঢেউ ওঠে। ওরকম দেবলীলা তো আমরাও করতে পারি।

এত সুবাস আসছে কোত্থেকে? আমি বলি, 'কাছে কী কোন দেবালয় আছে?'

'না। এ হল স্বর্গের বিভূতি।' তার কণ্ঠে কেমন আচ্ছন্ন ভাব।

'সবাই এ বিভূতি লাভ করতে পারে?'

'যাদের মধ্যে স্বর্গীয় আকৃতি থাকে তারা পায়।'

'স্বর্গীয় আকৃতি কী?' আমি জানতে চাই।

মধুর কটাক্ষ হেনে কল্পনা বলে, 'জানি না।'

আমি কল্পনাকে টেনে নিই বুকের মধ্যে। কল্পনা বাধা দেয় না। দুজনের দেহ থরথর করে কাঁপে। আমি মৃদুস্বরে ডাকি, 'কল্পনা—'

এমন সময় কাপ-ডিস ভাঙার শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। জেগে উঠি। কল্পনার পুষি বেড়াল। জানালা দিয়ে ঢুকে লাফিয়ে পড়েছে।

বাথরুমে যাবার সময় দেখতে পাই ডাক্তার-কাকার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। থমকে দাঁড়াই। শুনতে পাই পুরুষ কণ্ঠস্বর।

'সেতুর সাথে একটু ইয়ে-টিয়ে আছে। ঐ পর্যন্ত। তাই বলে কী বিয়ে? বামন হয়ে চাঁদে হাত? নফরের ব্যাটা তো। না-হয় ডাক্তারই হয়েছে।'

মজা লাগে। কৌতূহল বাড়ে। শুনতে থাকি।

'নফরের ব্যাটা বলছো কেন?'

'বলবো না? ওর বাবা তো অফিসে নফরের কাজ করত।'

'তা হোক। সুপাত্র তো বটে। আহা কী চমৎকার ছেলে!'

'হুঁ। সে-কারণেই তো তোমার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিয়েছি।'

বিচলিত হই। শুনতে প্রবৃত্তি হয় না। চলে আসি।

দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে মগজে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। শুয়ে পড়ি। ক্রোধে-দুঃখে-অভিমানে-অপমানে আমার মন ভারাক্রান্ত। কথাগুলো হজম করা আমার পক্ষে শক্ত। কীল খেয়ে কীল চুরি করা অসম্ভব। বিয়ের সাধ ঘুচিয়ে দেব। উত্তেজিত হয়ে পড়ি। হঠাৎ মনে হয় গোটা ব্যাপারটা এক 'চক্রান্ত'। সেতুর সাথে বিয়ে ভেঙে দিয়ে কল্পনাকে আমার ঘাড়ে চাপানোর মতলব। তাহলে তো ডাক্তার-কাকা মানুষ হিসেবে মোটেই সুবিধের নয়। আমাকে তোয়াজ করার উদ্দেশ্য বেশ বোঝা গেল। ঠিক আছে। দেখব। জল কতদূর গড়ায়।

'ওঠো। বেলা হলো যে—।'

আমি উঠে বসি। কাপে চুমুক দিয়েই রেখে দিই। রাগের উত্তাপ তখনও আমার শরীরে।

প্রাতরাশও নিয়ে এলেন কাকিমা নিজে।

অমন চর্বা-চোষ্য খাদ্য। তবু-ও আহারে আমাব অনীহা। ভদ্রতার খাতিরে খেতে বাধ্য হলুম।

আমি খাচ্ছি। কাকিমা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার-কাকা ঘরে ঢুকলেন। মুখে তাঁর সজ্জন-সুলভ হাসি। রাগে গা বি রি করে ওঠে সবই অভিনয় বলে বোধ হয়। ভণিতা না করে,তিনি অনুনয়ের কণ্ঠে বলেন, 'আজকের দিনটা থাকলে হোত।'

আমার তখন ইচ্ছে হলো —ডাক্তার-কাকাকে কড়া কথা,শুনিয়ে দিই। থাকবো কী জন্যে? বাবার কুৎসা শুনতে? তোমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করতে? হাজার হোক গুরুজনে। কাকুর অসুখ-বিসুখে তিনিই একমাত্র ভরসা। মনের ভাব চেপে বলি, 'না ডাক্তার-কাকা, যা ভাববেন।'

যাবার জন্যে তৈরী হই।। কাকিমা বলেন, 'কিছুই তো খেলে না। পরীক্ষা মিটে যাক। আবার এসো।'

'দেখি।'

'দেখি, নয়। আসা চাই-ই।'

ডাক্তার-কাকা ও কাকিমাকে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালুম। 'আবার এসো। কল্পনা, কল্পনা কোথায় গেলি মা—'

কল্পনা নীরবে এসে দাঁড়ায়। মায়ের ইঙ্গিতেই সম্ভবত সে ঢিব করে প্রণাম করে। আমি পা সরিয়ে নিই।

॥ এগারো ॥

একদিন সকালে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশটা বিচ্ছিরি ঘোলাটে। অল্প গুমোট ভাব। খোলা জানলার ধারে চেয়ারে বসে বই-এর পাতা উলটাচ্ছি, প্লেটে খান-কতক নিমকি দিয়ে গেলেন মা। আহার ও অধ্যয়ন—দু'টো কাজই চলেছে এক সাথে। বেশিক্ষণ চালাতে পারলুম না। চিন্তাগুলোকে যত ঠেলতে চাই ততই চেপে বসে। বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চায় না। সেইসঙ্গে জ্বালা ও যন্ত্রণা। 'নফরের ব্যাটা।' একথা কী করে বললেন? আজ আমরা গরিব, কিন্তু বরাবর কি এমন ছিলুম? আচ্ছা ডাঃ চৌধুরী সত্যই কী আমাকে অন্য চোখে দেখছেন? সেতুর সঙ্গে মেলামেশায় তাই কী এই সতর্কতা? দু দিক থেকেই জট পাকাচ্ছে। সেতুর প্রতি দুবলতা রাখা চলবে না। বড়লোকী খেয়াল। আজ মাথায় তুলবে কাল পায়ের তলায়। আমি কারো খেলার পুতুল হতে রাজি নই। মন অনেকটা স্থির হল। মনে হল, পথ যেন পেয়ে গিয়েছি। একাই চলতে হবে। এবং তাই চলব। এতক্ষণে বেশ ঝরঝরে হতে পারলুম। হাল্কা লাগছে।

যাকে ভাবিনি, সে-ই এলো। সেতু। যথারীতি ঝলমলে পোশাক এবং সপ্রতিভ ভঙ্গী।

'কী বই পড়া হচ্ছে দেখি—' সেতু ছোঁ মেরে বইটা তুলে নেয়। 'ওরে বাবা এ যে ডাক্তারি বই। আমি ভেবেছিলুম—'

আমি হাসতে থাকি।

'কল্পনার জন্মদিনে গিয়েছিলে, শুনলুম।'

'ঠিকই শুনেছো।' আমি সহজভাবে বলি।

'তা উৎসব হল কী একমাস?

'তোমাকে টেক্কা দেবে তার সাধ্য কী।' আমি তার খোঁচা টের পাই। ঈর্ষা না কি?

'তা কল্পনা মেয়েটা কেমন?' সেতুর কথায় তখনও খোঁচা।

আমার ভুরু এবার কুঁচকে যায়। বলি, 'লোকে ওর রূপের প্রশংসা করে।'

'তুমি ?'

'আমার চোখে সব মেয়েই সুন্দরী।'

'বেশ কথা শিখেছো তো।' হেসে ফেলে। বুঝলুম মানুষকে হাসানো আর রাগানো ওর স্বভাব।

সেতু হাতের বড় ব্যাগ খুলে একগাদা কাগজ বের করে। বলে, 'রেখে দাও।'

আমি এক নজরে কাগজগুলো দেখে বিস্ময়ে বলি, 'এ-যে দলিল ! কী হবে ?'

'তা তো জানি না। বাবা দিতে বলেছেন। দিলুম। ব্যস।'

'জানো না ?'

'বাব্বা ! এত জেরা করছো কেন ? পড়েই দেখো না।'

আমি পড়ে ফেলি। আমার চক্ষু স্থির। দানপত্র ! বাড়িটা আমার নামে লিখে দিয়েছেন মেসোমশাই। অবাক কাণ্ড ! আমি বলি, তোমাকে দিলেই তো হত।'

'একই কথা।' সেতু উঠে দাঁড়ায়।

'তাড়া কিসের ? আরেকটু বসো।'

'বা রে। আমার বুঝি পরীক্ষা নেই ?'

'দলিল-টা তোমার কাছেই থাক। নাও। ধরো।'

'যার জিনিস সে-ই নিক।'

চলে যায়।

যথাসময়ে আমাদের পরীক্ষা শেষ হল। ফল বেরুনোর জন্যে অধীর প্রতীক্ষা ও উৎকণ্ঠা। অস্থিরভাব কাটাবার জন্যে একদিন সেতুদের বাড়ি গেলুম। মাসিমা যেন আনন্দই পেলেন। বলি, 'সেতুকে দেখছি না যে ?'

'প্রেমাঙ্কুর এসেছিল। কোথায় যেন বেরিয়েছে দুজনে।' বলেন মাসিমা।

শুনে, আমি গুম হয়ে যাই। সহজভাবে নিতে পারি না।

'মেসোমশাই কোথায় ? নেই বুঝি ?' আমি প্রসঙ্গ হাতড়াতে থাকি।

'বসো। এসে পড়বেন এখনি। বলে গেছেন তো তাড়াতাড়ি ফিরবেন—'

মাসিমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মেসোমশাই ফিরে এলেন। এসেই আমামার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তোমরা দু জনেই পাশ করেছ। ফল শীঘ্রি বেরুবে।' আবার বললেন, 'এবার প্র্যাকটিসে বেশি করে মন দাও। একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কয়েকদিন বাদে। বেলা বারোটা হবে। ডাক-পিয়ন আমাকে একটা রেজিস্ট্রী চিঠি দিল। খুলে দেখি, পরীক্ষার ফল। উৎরে গিয়েছি। বাবা-মাকে খবরটা জানালুম তৎক্ষণাৎ। ভাবলুম, সেতুও চিঠি পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাকে অভিনন্দন জানান দরকার।

সেতুর বাড়ি যাবার জন্যে আমি পোশাক বদল করছি। সেতু এলো। এসেই, সে ঢিপ ঢিপ বাবা-মাকে প্রণাম করে। হঠাৎ আমাকে। আমি কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করি। 'এ আবার কি।'

সেতুও পাশ করেচে শুনে বাবা-মা আনন্দ প্রকাশ করেন। মা তার চিবুক ছুঁয়ে আদর করেন। বাড়িতে তখন খুশির বন্যা। আমি বলি, 'তোমাকে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিলুম।'

'তার আগেই আমি। হেরে গেলে তো।'

'ঠিক বলেছ, মা।' মা হাসতে থাকেন।

সেতু রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে, 'অতিথি এসেছে দ্বারে। চল। দেখবে।'

'অতিথি।' আমি বিস্মিত।

'হ্যাঁ। তাকে বরণ করতে হবে।' সেতুর ঠোঁটে চাপা হাসি।

সেতুর হেঁয়ালি বুঝতে পারি না। কৌতূহল জাগে।

দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মানীয় অতিথি। ঝকঝকে ফিকে-সবুজ রঙ।

'অ্যাম্বাসাডর। কিনলে বুঝি, মা?' বাবা প্রশ্নমাখা চোখে তাকান।

'হ্যাঁ। আপনার ছেলের জন্যে।'

আমি থ' বনে গেলুম। বলে কি। আমার জন্যে!

বাবা-মা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচ সাফ করে বাবা এগিয়ে গেলেন। মাও মোটরের কাছে এগিয়ে যান। সেতু দরজার পাল্লা খুলে দেয়। বাবা-মা গাড়ির ভেতরটা দেখেন। গাঢ় সবুজ রঙের ফোমের গদি। ভিতরটা যেন আনন্দপুরী।

'কী ? পছন্দ হয়েছে ? সেতুর চোখে কটাক্ষ।

কথা বলতে পারি না।

'গ্যারেজ খুলে দেবে ?'

'দিচ্ছি।'

গ্যারেজ করে মোটরের চাবি আমার হাতে তুলে দিল সেতু।

আমরা দু'জনে ঘরে এসে বসি। মা ইতিমধ্যেই খাবার তৈরী করে ফেলেছেন। সেতু বলে, 'বেশ মুখরোচক তো।'

'হ্যাঁ। মায়ের হাতে রান্নার স্বাদই আলাদা।' খেতে খেতে বলি, 'হাতি পোষা। রোজগার যা, খরচ পোষাতে পারবো তো ?'

'বাবা তাও ভেবে রেখেছেন।'

'কী ভেবেছেন ?'

'তা জানি না।'

'বেশ। কিন্তু চালাবে কে ?'

'কেন তুমি।'

'আমি চালাতে জানি নাকি ?'

'আমি শিখিয়ে দেব।'

'তার মানে রোজ তোমাকে আসতে হবে।'

'আসব।'

'তাহলে কোনদিনই আমি শিখব না।'

'মানে ?'

'শুধু তোমার পাশে বসে থাকব।'

সেতু গম্ভীর হয়ে যায়। উঠতে যাচ্ছিল, আমি বলি, 'আচ্ছা, প্রেমাঙ্কুর ভদ্রলোক কেমন ?'

সেতু বসে পড়ে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। 'কেন বল তো ?'

'এমনি।'

'কারো অবর্তমানে তার সম্বন্ধে আলোচনা করা কী উচিত ?' সেতু তেমনি গম্ভীর।

'ঠিক তো নয়।' আমি সংকুচিত হই।

'তবে ? প্রেমাঙ্কুরদা সম্পর্কে কী তোমার কোন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ?'

বুঝতে পারি সেতু চটে গেছে। তাই প্রসঙ্গ লঘু করতে আমি মুখে

হাসি টানি। 'তোমাকে সহজেই রাগানো যায়। এত সহজে রাগতে আছে? তাঁকে কত শ্রদ্ধা করি তা তো জানো।'

সেতু উঠে পড়ল।

বলি, 'চলো, পৌঁছে দিই।'

'না থাক। সোজা বাড়ি যাচ্ছি না। এখন নিউমার্কেট, তারপর বালিগঞ্জ ঘুরে বাড়ি।'

'তাতে হয়েছেটা কী? আমি না-হয় তোমার সঙ্গে একটু ঘুরলুম। তাছাড়া আমার নিজে গিয়ে তোমার বাবা-মাকে পরীক্ষার ফলটা জানান উচিত।'

'উঁহুঁ, যেতে হয় অন্য দিন যেয়ো। কেউ বাড়ি নেই।'

'কোথাও গেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, ভরতপুর। ফিরতে ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। আবার না-ও ফিরতে পারেন।'

'ডাক্তার-কাকার বাড়ি কি?'

'তাছাড়া আর কোথা যাবেন?'

'পরীক্ষার ফল জানাতে বুঝি?'

'তা হবে।' অনাসক্তভাবে বলে সেতু।

'ঠিক আছে। তবু তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, চলো।'

ট্যাক্সির তল্লাস করতে করতে আমরা ধর্মতলার দিকে এগোতে থাকি। 'তোমাকে একটা খবর জানাতে ভুলে গেছি।' চলতে চলতে বলে সেতু।

'কী খবর?'

'শিগ্গির চাকরি পাচ্ছ। বাবা বলেছেন।'

'দারুণ খবর তো। চলো আমি আজ তোমাকে খাওয়াব।'

হল না। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে থামে। এক সওয়ারি নামে। তিলার্ধ দেরি না করে আমি দৌড়ে গেলুম। সেতু চটপট উঠে বসে। হাত নেড়ে সে বিদায় জানায়।

ফিরছিলাম বেশ একটা ধাঁধায় পড়ে। সেতুর এ-ধরণের আচরণের মানে কি? ওর বাবা-মা তো ওকে আগলে রেখেছেন। আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা বারণ। আবার মেসোমশাই-এরই এ-রকম আচরণ কেন? পরীক্ষায় পাশ করেছি বলে একেবারে অ্যামবেসেডর! বাড়াবাড়ি না কি?

পরের দিন। প্রাতরাশ সেরে সবে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি, মা এলেন। হাতে পুজোর ডালা। বললেন, 'খোকা। গাড়িটা বের কর তো।'

'কোথাও যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। কালীঘাট। মায়ের পুজো দেব। মানসিক আছে।'

'মা, আমি এখনও গাড়ি চালাতে শিখিনি। তুমি বরং ট্যাকসিতে যাও। আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি—'

'তুই সঙ্গে যাবি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুই। তোর নামেই পুজো, চল।'

কালীঘাট পৌঁছে পুজোর ডালি সাজিয়ে মন্দির-চত্বরে ঢুকলেন মা। পিছু পিছু আমিও। রীতিমত ভিড়। ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের গন্ধে বাতাস ভারি। হঠাৎ মনে হল এটা কী বায়ুদূষণ নয়? মা যখন ঢুকলেন মন্দিরের অভ্যন্তরে, আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম মুণ্ডমালিনীর করাল বিগ্রহ। ভয়ংকরী দেবীর ভঙ্গিমা দেখে আমার মনে তখন নানা প্রশ্ন জাগছিল। উনি কী 'বিনাশের দেবী'? তাহলে ওঁর শরণাপন্ন হলে কী উত্তরণের সন্ধান মেলে? লকলকে জিহ্বা কিসের ইঙ্গিত? রক্তপান? নাকি, দেবাদিদেবের বুকে পা ফেলে লজ্জা? শাস্ত্রে বহুবিধ ব্যাখ্যা থাকতে পারে, আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছিল না। তাছাড়া একটা কালীমন্দিরই তো যথেষ্ট। পথে-ঘাটে এত কালী ও শনি-মন্দির কেন? যুব-সমাজে উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানাপ্রকার নেশা প্রবল হয়ে উঠছে।

পুজো, প্রণতি ইত্যাদির দ্বারা দেবীকে তুষ্ট করে মন্দির-অঙ্গনের বাইরে এলেন আমার মা। দেবী তুষ্ট হলেন কিনা জানি না। হাতে তাঁর দেবীর প্রসাদ। শতছিন্ন পোশাকে নগ্ন শিশু-কোলে গুটিকতক ভিখারিণী আমাদের তখন ঘিরে ধরে। দেখি, তাদের ঘোলাটে চোখে বঞ্চনা ও হাহাকারের প্রতিচ্ছবি। বিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও ওরা দু মুঠো খেতে পাবে কি?

তখন সেপ্টেম্বর মাস। আমরা বাড়ি ফিরছি। রাস্তার ধারে সারবন্দী বস্ত্র-বিপণি। মা বলেন, 'দেখ্‌ খোকা, এবার পুজোয় সেতুকে সিল্কের শাড়ি দেব। কিনে দিস ত।'

'ঠিক আছে, মা। পুজো তো এসে গেল। বড় জোর হপ্তা তিনেক দেরি। আজই কিনলে কেমন হয়?'

'টাকা আছে?'

'শাড়ি কেনা যাবে।'

তখন মা বললেন, 'বেগুনী-কমলা রঙ হলে সেতুকে মানাবে ভাল।'

পছন্দসই শাড়ির খোঁজে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরছি। একটা শাড়ি পছন্দ হয়। দোকানী বলে, 'কাশ্মীরি জর্জেট। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ-পীস। যেভাবে ইচ্ছে পরা যায়। কুঁচকে যায় না।'

'দাম?'

'দোকানী বলে, 'এক হাজার এক টাকা'।

'মা, পছন্দ?'

মা ঘাড় নাড়ে। বলি, 'প্যাক করুন'।

বাড়ি ফিরে বলি, 'মা, শরীরটা ভাল ঠেকছে না। খেতে রুচি নেই।'

মা কপালে তাঁর হাত ঠেকালেন। 'ছ্যাকছ্যাঁক করছে যে—। জ্বরটর হয়নি ত?'

থার্মোমিটারে ধরা পড়ে—দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। অল্পক্ষণ বাদে কাঁপনি। সারা শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করি। বিছানায় শুয়ে পড়ি।

ডাঃ এস. বসু এলেন। পাড়ার প্রবীন চিকিৎসক। তিনি পরীক্ষা করে বলেন, 'ফ্লু'। ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন।

আমি শুয়ে আছি। সেতুর কথা মনে পড়ে। ইস্ ওদের বাড়ি যাওয়া হল না। ভেবেছিলুম সেতু আসবে। নিষ্ফল প্রত্যাশা। ছ' সাত দিন পরে সুস্থ হয়ে উঠি।

॥ বারো ॥

এক পাঞ্জাবি যুবক ইতিমধ্যে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিয়েছে, তবু একা চালাই না। পাশে সে বসে থাকে।

একদিন সন্ধের পর। চেম্বার-ফেরতা শাড়িটা বগলদাবা করে চলেছি মোটর হাঁকিয়ে। ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি চালাচ্ছি ধীর গতিতে। সেতুদের

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাই। গেটের কাছে আসতেই আমার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। এ কী! দরজায় তালা। দারোয়ান জান-বাহাদুর দৌড়ে এল। আমি জিগোস করি, 'কী ব্যাপার?'

'সাব বাহার গিয়া।'

'মেম সাব, দিদিমণি?'

'জী সাব।'

'কোথায়? কবে?'

'দক্ষিণ ভারত। দো রোজ গিয়া।'

'আচ্ছা, কবে ফিরবে বলতে পারো?'

'মালুম নেহি।'

'সঙ্গে আর কেউ গেছে?'

'জী সাব।'

'কে?'

'প্রেম সাব।'

'মানে প্রেমাঙ্কুরদা?'

'জী সাব।'

এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। স্বাভাবিক। তবু কি ঈর্ষার জ্বালা বোধ করলুম?

ফিরে আসি।

'কী হলো? শাড়ি ফেরত আনলি যে—' জিগ্যেস করলেন মা।

'ওরা কেউ বাড়ি নেই।'

'মানে?'

'বেড়াতে গেছে।'

রাতের বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকি। আমার সারা দেহে কেমন-যেন একটা জ্বলুনি। গরম বোধ হয়। রাত বাড়ে। স্থির হবার চেষ্টা করি। কেবলই ভাবনাটা পাক খায়। বেড়াতে গেছে? যেতেই পারে। আমি কী এতই অপাংক্তেয়? একবার বলতে পারল না? নাকি ভুলে গেছে? ভোলা কি এতই সহজ? আবার সেই দূরত্ব ঘনিয়ে উঠছে। সময় বিশেষে আমার চেয়ে প্রেমাংকুরদার গুরুত্ব বেশি। তবে তো ভালবাসাও পেতে পারতেন প্রেমাংকুরদাই। আমি কি খেলার পুতুল? অভিমানে দুঃখে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমতে পারি না।

দেখতে দেখতে পুজো আসে আবার চলেও যায়। কালীপুজো আসে। আমি প্রতীক্ষায় দিন গুণছি। না, সেতুরা এখনও ফিরে আসেনি। এলে, খবর পেতুম।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এসে গেল। সেদিন সকাল আট-টা হবে। অনুষ্ঠান-পর্ব শুরু হয়েছে। ভায়ের কপালে টিপ দেওয়া হচ্ছে আর যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ছে কিনা কে জানে। মাথা পেতে দিদিদের ধান-দুর্বার আশীর্বাদ নিচ্ছি আর রেকাবি-ভর্তি খাবার খাচ্ছি। হঠাৎ ডোর-বেল বেজে ওঠে। আমি দরজা খুলে দিলুম। রঙ্গলালকে দেখে বিস্মিত হলুম। রঙ্গলাল হল ডাঃ চৌধুরীর মোটর-চালক। সে মেসোমশাইয়ের হাল্‌কা নীল রঙের ফিয়াট চালায়। গাড়ির ভেতরটা দেখে নিলুম। ফাঁকা। কেউ নেই। রঙ্গলাল সেলাম ঠুকে একটা চিঠি আর কাগজের প্যাকেট দেয়। প্যাকেট খুলে দেখি—ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। চিঠির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম। মাসিমার লেখা। মাকে পড়ে শোনালুম। মা বললেন, 'পুজোর উপহার। ভালই হয়েছে। প'রে এখুনি যেতে বলেছেন। সেতুর শাড়িটা নিয়ে যা।'

বাবা জিগোস করলেন, 'এত জরুরি তলব কেন?'

'কে জানে?' মা বললেন।

'আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।'

'তোমার মন সব সময় কু গায়। যাবে না কেন?'

'বেশ তবে যাক।'

আমি মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলাল গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়।

গাড়ি থেকে নেমে সেতুদের বাড়িটা দেখে বিস্মিত হই। বাড়ির সামনে সার সার মোটর পার্ক-করা। দেবদারু পাতায় মোড়া বাহারি ফুলের তবক ফটকের গায়ে ঝোলানো। গোলাপী পাগড়ি মাথায় জান-বাহাদুরকে দেখে চমৎকৃত হই। সে দাঁড়িয়ে আছে যেন সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী। তার সেলাম ঠোকার ভঙ্গিটাও মিলিটারি। বাড়িটা অতিথি-সমাগমে গমগম করছে। তাদের কলহাস্যে সারা বাড়ি মুখরিত। ক্যাসেট-প্লেয়ারে বাংলা-হিন্দি গান। সব মিলিয়ে উৎসবের হাওয়া। সংশয় দেখা দেয় মনে। বিয়ে বাড়ি নাকি? কার বিয়ে? তক্ষুণি মনে পড়ে এটা কার্তিক মাস। কার্তিক মাসে বিয়ে হয় নাকি? ধন্দ কেটে গেল। তবে কিসের উৎসব? ভাই ফোঁটার? তাই-বা কি করে হয়? সেতুর ভাই কোথা? তবে? বিজয়া সম্মিলনীর ফ্যাংশন? তাই সম্ভব।

সিঁড়ির মুখে মেসোমশাইয়ের সাথে দেখা তাঁকে প্রণাম করি। তিনি নিবিড় আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধে ফেললেন। আমার অভিমান দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'ওপরে যাও।'

ওপরে উঠতেই বারান্দায় মাসিমার সাথে দেখা। তাঁকে প্রণাম করে শাড়িটা দিলুম। শাড়ি দেখে তিনি বলেন, 'সুন্দর শাড়ি। তোমার পছন্দ আছে।'

এক বয়স্কা মহিলা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন।

'আমার দিদি,—তোমার বড় মাসিমা।'

প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে ঘরে বসতে বলেন। আমি ঘরে ঢুকি। মনোজ্ঞ পরিবেশ। পরিচ্ছন্ন। জনা চারেক কিশোরী ও সুদর্শন দুই তরুণ কার্পেটের একাংশ জুড়ে বসে আছে। সম্পর্কে তারা সেতুর মাসতুতো ভাই-বোন। আমি বসলুম একটু তফাতে। দু মাসিমা ঘরে ঢুকলেন। পিছনে অবগুণ্ঠিতা ও কে? কাশ্মীরি জর্জেট পরনে। চমকে যাই। ঘরসুদ্ধ সবার দৃষ্টি তখন আমার দিকে। আমি সোজাসুজি তাকাতে সংকোচ বোধ করি। বারেক দেখেই দৃষ্টি অবনত করি। মস্তিষ্কের কোষে কোষে তখন চিন্তার ঝড়।

'মানু, মুখ তোলো।'

কপালে চন্দন-টিপ পরায় সেতু। প্রণাম করে।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিমূঢ়। মাসিমাদের চোখে কিন্তু তৃপ্তির হাসি। সেতুর মুখে আশ্চর্য এক প্রশান্তি। আমি স্তম্ভিত। বিহ্বল। হতবাক।

সেতুই আমার মুখে তুলে ধরে মিষ্টি।

'দাদা, খান!।'

আমার বিস্ময়ের ঘনঘোর তখন অনেকটা কেটে গেছে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ সতেজ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারখানা ঠিকঠাক বুঝে ফেলি। এ এক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি। কৌশলে আমাকে সরাবার চেষ্টা। চিৎকার করে উঠি: 'আমাকে কী পেয়েছেন আপনারা? খেলার পুতুল? চললুম।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমার সর্বাঙ্গ তখন রাগে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে

সেতুর সম্পর্কিত ভাইয়েরা তখন আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরেছে।

'অত রাগছেন কেন, দাদা? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন।'

'সেতু তোমার বোন। সকাল থেকে সে উপোস করে আছে। তুমি না খেলে ও তো খাবে না।' মাসিমা আমার পিঠে হাত দিয়ে শান্ত

করতে চান।

'বোন! খুব হয়েছে। আমাকে যেতে দিন।'

'হ্যাঁ সেতু তোমার বোন।' মেসোমশাই বলেন, 'আমাদের ওপর তোমার দাবি আছে, অনেক অনেক দাবি। রক্তের দাবি। যেমন সন্তানের দাবি তার পিতার কাছে।' আবার বলেন, 'খেয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। নিচে আছি।'

অসম্ভব মানসিক চাপের মধ্যে আমি তখন দিশেহারা। বড-মাসিমা মিষ্টিগুলো একটা-একটা করে খাইয়ে দিলেন। মা যেমন তাঁর সন্তানকে খাইয়ে দেন, তেমনি। আমি আর আপত্তি করতে পারলুম না। আপত্তি করারই-বা কী আছে? সেতু পলকহীন চোখে দেখছিল।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামি। মেসোমশাইয়ের কথাগুলো তখন আমাব মনে তুমুল ঝড় তুলেছে। আকস্মিক বিপর্যয়। সামলাতে পারি না। ব্যাকুল হয়ে পড়ি। হতাশা ও ক্লান্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রাশি রাশি চিন্তা সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। এ কী হল? নিচের ঘরে ঢুকি। বসি।

'অরবিন্দই তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।' মেসোমশাই নিবে-যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ইঙ্গিত বাঁকা হলেও স্পষ্ট। বিয়ে ভেঙে যাবার মূলে তাহলে ডাক্তার-কাকা নিজে। কল্পনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার চক্রান্ত? আমি তীব্র জ্বালা অনুভব করি।

মেসোমশাই দেরাজ থেকে একটা বাঁধানো আলোক-চিত্র বের করেন। আমার হাতে সেটা দিলেন। 'দেখতো, চিনতে পারো কী?'

আমি এক নজরে ছবিটা দেখে নিলুম। ওটা সেতুকে দিয়েছিলুম একদিন। বিপত্তির কারণ কী তাহলে এই ছবিটা? বলি, 'আমার। তেরো বছর বয়সের।'

মেসোমশাই অপর একটা আলোকচিত্র দিয়ে জিগেস করলেন, 'এটা?'

এবার থতমত খেলুম। ইতস্তত: করে বলি, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ছবির সাথে অসম্ভব মিল।'

মেসোমশাই চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার। তেরো বছর বয়সের।' তাঁর মুখ থেকে গাম্ভীর্যের আবরণ সরে যায়। হেসে উঠলেন।

'আশ্চর্য!'

মেসোমশাই ডান পা টেবিলের ওপর তুলে দিলেন। 'দেখতো পায়ের তলাটা।'

অস্ফুটস্বরে বলি, 'জড়ুল।'

'তোমারও এ-রকম একটা জড়ুল আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'অবাক হচ্ছো?'

'অবাক হবারই তো কথা।'

'আচ্ছা, বেশ। তোমার মাথায় টাক পড়ছে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি লজ্জিত কণ্ঠে বলি।

'এই দেখো। বয়সকালে আমারই মতন হবে।' মেসোমশাই তাঁর টাকে হাত বুলিয়ে নিলেন।

মেসোমশাইয়ের এই কথাবার্তার ধরণ আমার পছন্দ হয় না। যেন পুলিসী জেরা। অসম্মানজনক। প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হয়। প্রতিবাদ করারই-বা কী আছে? অসহায়ের মতো বসে থাকি।

'আচ্ছা, তোমার-আমার মধ্যে গায়ের রঙে বিশেষ তফাৎ আছে?'

আমি বিব্রত বোধ করি। প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি না। বলি 'প্রায় একই রকম—ফরসা।'

'ভাবছো কাকতালীয় ব্যাপার।' মেসোমশাই বলেন, 'আরো আছে। আচ্ছা, তোমার বাবা-মায়ের মাথায় এখনও একরাশ চুল। গায়ের রঙ কালো। তাই না?'

উত্তেজিত হয়ে পড়ি। মেসোমশাই কী বলতে চাইছেন? এত জেরা কেন? বিরক্তির সঙ্গেই বলি, 'জিনের কারসাজি হতে পারে।'

'শারীরিক সাদৃশ্যের ব্যাপারটা জিনের কারসাজি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু রক্তের ব্যাপারটা?' তিনি চুরুট টানতে থাকেন।

'রক্ত!' বিস্মিত হই।

'তোমার ব্লাড-ট্রানসফিউসনের কথা মনে আছে?'

'আপনিই তো রক্ত দিয়েছিলেন।'

'ভেবেছো কি, তোমার বাবা-মা থাকতে আমিই-বা রক্ত দিলুম কেন?'

ভাবতে থাকি। আগে তো এ-চিন্তাটা ঠিক মাথায় আসেনি।

মেসোমশাই হাসলেন। 'শোনো, তোমার বাবা-মা দু'জনারই রক্ত 'বি' গ্রুপের। আর তোমার রক্ত 'এ' গ্রুপ। আমার আর সেতুরও তাই।

তখন ব্লাডব্যাংকে 'এ' গ্রুপ রক্তের প্রচণ্ড অনটন। অগত্যা আমাকেই রক্ত দিতে হল!' তিনি চুরুটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিলেন। বলেন, 'তোমার রক্ত 'বি' অথবা 'ও' গ্রুপের হওয়া উচিত ছিল। কেন এই ব্যতিক্রম?'

এবার ধাঁধায় পড়ে গেলুম। বিমূঢ় ভঙ্গিতে শুধু চেয়ে থাকি। তিনি হাসতে থাকেন। এমন সময় ডাক্তার-কাকা আর তাঁর পিছু-পিছু আমার কাকু। অপ্রত্যাশিত। ডাক্তার-কাকার হাসিমুখ। কিন্তু কাকুর মুখে-চোখে উদ্বেগের ছাপ। ডাক্তার-কাকাকে দেখে আমি খুশি হই না।

ডাক্তার-কাকা আমাকে দেখছিলেন। 'পাশ করেছ শুনে খুব খুশি। তোমার কাকিমা আর কল্পনা একদিন যাবে তোমাদের বাড়ি। শরীর ভাল ত?'

আমি প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলুম, 'ভাল আছি।'

কাকু কিন্তু নিশ্চুপ বসে থাকেন।

ঘরের বাতাস বেশ থমথমে। ডাক্তার-কাকা বলতে থাকেন, 'ঘটনা যে এদ্দুর গড়াবে ভাবতে পারিনি। যথাসম্ভব চেপেই তো রেখেছিলুম। স্রোত ভিন্ন খাতে বইছে দেখে শংকিত হয়ে পড়ি। তাই বাধ্য হলুম সব কথা জানাতে। ভাই-বোনে বিয়ে—? মানু, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হয়ে তুমি কী সমর্থন করবে?'

মাথা আবার গরম হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে পড়ি। জিগ্যেস করি, হেঁয়ালি ছাড়ুন। পরিষ্কার করে বলুন—'

'হেঁয়ালি নয়।' ডাক্তার কাকা শান্তভাবে বলেন, 'একেবারে বাস্তব ঘটনা। শোন, তোমার বাবার যে ডায়বেটিস আছে, তুমি জান। তোমার জন্মের আগে তাঁর ফুসফুসে যক্ষ্মা আর অরকাইটিস (Orohitis) হয়। আমারই চিকিৎসায় সারে। তিনি সুস্থ হবার পর বেশ ক'টা বছর কেটে গেল। তাঁর আর কোন সন্তানাদি হল না। তোমার মা একটা পুত্র-সন্তানের জন্য আকুল হয়ে উঠলেন।'

আমার উত্তেজনা বাড়ছিল।

'ডাক্তার দেবব্রত মুখার্জিকে চেনো নিশ্চয়।' তিনি বলেন।

'চিনি।' আমি বলি, 'কলকাতার বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ-বিশারদ।'

'ঠিক। তাঁর কাছে তোমার বাবা-মাকে নিয়ে যাই। সঙ্গে তোমার কাকু

আমি শুনতে থাকি। এ-কাহিনী আমার জানা ছিল না।

'তোমার মাকে পরীক্ষা করে ডাঃ মুখার্জি বলেন, 'ঠিক আছে। তোমার বাবার শুক্র পরীক্ষা করা হয়। আমার বেশ মনে আছে, স্বয়ংচল শুক্রাণুর সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। সে-রকম অবস্থায় যে প্রজনন সম্ভব না, তুমি জানো, আমিও জানি। অথচ তোমার মা পুত্র-সন্তানের জন্য অস্থির। কী করা যায়?'

ডাক্তার-কাকা বলছিলেন, 'আমি আর তোমার কাকু দু'জনে ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার মায়ের কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করি। এছাড়া অন্য পথ ছিল না।'

শুনে, আমি শিউরে উঠি।

তিনি বলছিলেন, 'সবার মনোবল তো সমান না। তাই ব্যাপারটা গোপন রাখি। এমন-কি তোমার বাবা-মার কাছেও। তোমার মা-কে বুঝাই—জরায়ুতে একটা ছোট অস্ত্রোপচার করলেই সন্তান-ধারণ সম্ভব। তিনি সম্মতি দিলেন। তোমার বাবাও।'

আমার মধ্যে তখন প্রবল উত্তেজনা।

ডাক্তার-কাকা ফের বলতে শুরু করলেন, 'শুক্রাণু-সংগ্রহের সমস্যা দেখা দিল। তোমার কাকুকে অনুরোধ করি। তিনি রাজি হলেন না। উলটে অনুরোধ করেন আমাকেই। আমি তখন মাম্‌প্‌সে (Mumps) ভুগছি। সেক্ষেত্রে কাজ হবে না জেনে ফের তোমার কাকুকে অনুরোধ করি। তিনি তখন যুক্তি দেখালেন, 'উনি আমার বৌদি। মাতৃস্থানীয়া।' কী করি? চাই একজন বিশ্বস্ত শুক্রদাতা। আর তখনি মনে পড়ে ডাঃ চৌধুরীকে। বন্ধু। একান্ত বিশ্বাসভাজন। তাঁকেই শেষে অনুরোধ করি। তিনি রাজিও হলেন। তবে কার জরায়ুতে তাঁর শুক্রাণু সংস্থাপিত হচ্ছে—সে-কথা তাঁর কাছে গোপন রাখি। আর তিনিও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। আর ডাঃ চৌধুরীর কথা তোমার কাকুকেও তখন বলিনি। যা হোক, তোমার মায়ের ডিম্বাণু সংগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে নিষিক্ত ডিম্বাণু তাঁর জরায়ুতে সংস্থাপন প্রভৃতি সমস্ত কাজ করেন ডাঃ মুখার্জি নিজেই।'

হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটে। প্রবলভাবে ঘামতে থাকি। মনে হল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। চিৎকার করে উঠি: 'তাহলে আমি জারজ!'

থরথর করে-কাঁপছিলুম। ওঁরা আমাকে ধরে চেপে বসিয়ে দেন।

মেসোমশাইকে বলতে শুনি, 'জারজ হতে যাবে কেন, বাবা? নলজাতক। এতে দোষের কী আছে? এ-রকম তো আজকাল আকছার ঘটছে।'

উত্তেজনা আর ঘৃণায় টগবগ করে ফুটছি। 'আকছার ঘটছে! আমার জীবনে কেন?'

কাকু আমার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে থাকেন। 'মিছে উত্তেজিত হচ্ছো। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। তোমার বেঁচে থাকার অধিকার কেউ কেড়ে নেয়নি। সমাজ তো তোমায় গ্রহণ করেছে, বাবা।'

তবু শান্ত হতে পারি না। 'সমাজ কখনই মেনে নেবে না। ঘৃণা করবে, উপেক্ষা করবে। ঘৃণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকা অর্থহীন।'

তবু ওঁরা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। ডাক্তার-কাকা বলেন, 'কেন বাবা, অকারণে উতলা হচ্ছো? কেউ ঘৃণা করবে না। সমাজ নিশ্চয়ই তোমায় গ্রহণ করবে। আমি কল্পনার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।'

ক্রোধে অপমানে আমি ক্রমশঃ হিতাহিত জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। সম্ভবত সামাজিক মূল্যবোধও। নিজেকে বড্ড হীন মনে হচ্ছিল। সান্ত্বনার বাণীকে মনে হচ্ছিল শয়তানের বাণী। আমাকে শয়তানের চক্রে আবদ্ধ করতে চায়। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

চিৎকার করে বলি, 'আপনারা সব শয়তান। কোল্ড মার্ডারার। খুনী।'

অসম্ভব জ্বালা। আমি ছুটে বেরিয়ে আসি। সেই থেকে কেবলই জিজ্ঞাসা: 'আমি কেন বাবার মত নয়? বলুন, আমার প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় কি? কে আমি?'